# সমস্যা ও সমাধান

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

জনাব মাওলানা ছাহেব "সমস্যা ও সমাধান" নামে কএকটা প্রবন্ধ মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশ করেন। প্রবন্ধগুলির দ্বারা মোছলেম বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের চিন্তাধারায় যে গুরুতর বিপ্লব উপস্থিত হয়, বোধ হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রবন্ধগুলি মাসিক পত্রের পুরাতন ফাইলে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহার সার্থকতা কমিয়া যাইবে বলিয়া কএকজন বন্ধু সেগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধ মতে আজ "সমস্যা ও সমাধান" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহাতে বিজ্ঞ পাঠকগণের বিচার-আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করি।

প্রকাশক

# দ্বিতীয় সংস্করণ

কএক বৎসর পূর্ব্বে আমদের দেশে এছলামের বিরুদ্ধে এক গুপ্ত অভিযানের সূচনা করা হইয়াছিল। এছলাম ধর্ম্ম যে বর্ত্তমান যুগে অচল, নানা প্রকার বিচার আলোচনার মধ্য দিয়া, এই মিথ্যাটাকে সত্যে পরিণত করিয়া দেখানই ছিল এই অভিযানের নায়কদিগের প্রধানতম লক্ষ্য। এই মারাত্মক অভিযানের গতিরোধ করার একমাত্র উদ্দেশ্যেই, আর্থিক ক্ষতির বিশেষ আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও "মাসিক মোহাম্মদী" প্রকাশ করিতে বাধ্য হই এবং তাহার "সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি প্রতিপক্ষের অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদ স্বরূপে লিখিত।

প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার পরও সমাজে যথেষ্ট সমাদর ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং উভয় প্রান্তের চরমপন্থী মুছলমান ভ্রাতাদিগের মন ও মস্তিষ্কে ইহা দ্বারা একটা সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক ঘটিয়াছে, ইহা জানিয়া আমি আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদা করিতেছি।

সমাজের সহানুভূতির ফলে সমস্যা ও সমাধানের প্রথম সংস্করণ বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। আল্লার ফজলে আজ তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। এই সংস্করণে "সুদ-সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধটা নূতন করিয়া ও বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। যুগের নবাগত জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর দেওয়ার এবং সংশয়-সঙ্কুল তরুণ মনের সমস্যাগুলির যথাসাধ্য সমাধান করার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল। দুর্ব্বল হস্তের নগণ্য সাধনার এই উদ্দেশ্য সফল হউক, করুণাময়ের দরগাতে ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

বিনীত

দীন লেখক

# বিষয় সূচী

# এছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার

## প্রস্তাবনা

জগতের সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র, সমস্ত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা-প্রণেতা, মানুষ-সাধারণের কল্যাণের জন্য আবহমান কাল হইতে বিভিন্ন প্রকারের প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। মানবীয় সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, দুন্য়ার বিভিন্ন উন্নতিশীল জাতি, নূতন জ্ঞানের আলোকে এবং মনুষ্যত্বের নূতন অনুভূতির প্রভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া, পুরাতনের পরিবর্ত্তন সাধন পূর্ব্বক তাহার স্থলে নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচলন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ইউরোপ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজতত্ত্বে নানা গূঢ় রহস্যের গভীর গবেষণার পর পূর্ব্বতন নিয়ম-পদ্ধতির বহু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু, অশেষ পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, দুন্য়ার কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্র, কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, কোন সমাজ-সংস্কারক, কোন ব্যবস্থা-প্রণেতা নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে যথাযথভাবে ধারণা করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু, তাঁহাদিগের সমসাময়িক মানব-সমাজ নানাদিক দিয়া নারীর প্রতি যে সকল নির্ম্মম ও অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া আসিয়াছেন, তাহার যথাযথ অনুভূতি কাহারও ছিল না। সুতরাং তাহার

প্রতীকারের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিবার আবশ্যকতাও কেহ বিশেষরূপে অনুভব করেন নাই। বরং তাঁহাদের অনেকেই নানাবিধ প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করিয়া নারীর মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়াছেন, বিবিধ পক্ষপাতমূলক অন্যায় ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া নারীকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার হইতে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

যুগে যুগে নির্ম্মমভাবে উপেক্ষিতা এবং আবহমান কালের উৎপীড়িতা এই নারীকে মাটি হইতে তুলিয়া তাহাকে সম্মান ও গৌরবের মছনদে বসাইয়া দিয়াছিল এছলাম,—আজ হইতে সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্বে। এছলাম ও তাহার প্রেমময় পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা নারীর মঙ্গল ও মুক্তির জন্য সেই সময় দুন্‌য়ায় যে অসাধারণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন, নারীকে যে মর্য্যাদা ও অধিকারের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক পরিচয় জানিতে হইলে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বেকার নারী জাতির সামাজিক অবস্থা এবং সর্ব্ববিধ স্বত্বাধিকারের কথা সর্ব্বপ্রথমে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, এই সভ্যতার চরম উৎকর্ষের দিনে "আদর্শ সভ্য জাতি সমূহ" বস্তুতঃ নারীকে যে স্বত্বাধিকার দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সূক্ষ্মভাবে তাহারও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলে একদিকে এছলামী শিক্ষার অতুলনীয় মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যেমন আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে, অন্যদিকে তেমনি যুগপৎভাবে আমরা ইহাও জানিতে পারিব যে, নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে এছলাম দুন্‌য়ার কার্য্যক্ষেত্রে যে সকল বাস্তব নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ পরিণত। কিয়ামত পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে—চলিতে পারিবে।

সুতরাং এই বিষয়টীর বিস্তারিত আলোচনা যে সময়সাপেক্ষ, বিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সে-সকল আলোচনা

আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া আজ আমরা নিজেদের সামান্য শক্তি অনুসারে দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, এছলাম বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে নারীকে সত্যকার কি মর্য্যাদা ও অধিকার প্রদান করিয়াছে এবং এছলামের এই শিক্ষা মুছলমানের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের পরতে পরতে কিরূপ চিরস্থায়ী ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত অবস্থায় ও সকল বয়সের স্ত্রীলোকদিগের ব্যাপক স্বরূপ হইতেছে—"নারী"। তাহার পর এই নারী আবার এক একটা বৈশিষ্ট্য লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হন—যথাক্রমে (১) কন্যারূপে—(২) স্ত্রীরূপে—ও (৩) মাতারূপে। নৃশংসতার সমস্ত ভাব-ধারাকে প্রতিহত করিয়া এছলাম, নারী এবং তাহার এই তিনটী বিশেষ স্বরূপ সম্বন্ধে দুন্‌য়ার বুকে যে স্বর্গের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কোর-আন ও হাদিছ হইতে তাহার কতকগুলি উদাহরণ প্রথমে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

## (১) নারী—কন্যারূপে

নারী দুন্‌য়ায় প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে কন্যারূপে। কিন্তু, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-সংসার, এমন কি স্বয়ং তাহার পিতা-মাতা যে নির্ম্মম উপেক্ষা, ক্রোধ ও ঘৃণার সহিত তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহার মধ্যে সমাজের যে সাধারণ মনোবৃত্তি লুক্কায়িত আছে, তাহার এবং তাহার অন্তর্হিত কারণগুলির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টভাবে জানা যাইবে যে, মানুষের সাধারণ ব্যবস্থা অনুসারে নারীগণ কন্যারূপে, স্ত্রীরূপে, ভগ্নীরূপে, মাতারূপে তাহাদের নিকট যে অপমান, যে উপেক্ষা এবং যে অবিচার, অত্যাচার লাভ করিয়া আসিতেছেন, সদ্যোজাতা এই কন্যাও ভবিষ্যতে স্ত্রী, মাতা ইত্যাদি রূপে অন্যের নিকট হইতে তদনুরূপ অপমান ও অত্যাচার সহ্য করিতে

বাধ্য হইবে—তাহা মানুষ সহজেই অনুমান করিয়া লয়। স্নেহভাজন সন্তানের শোচনীয় দুর্দ্দশার সেই চরম চিত্র তাহাদের কল্পনা-নেত্রে প্রতিফলিত হইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয় ক্ষোভে, ঘৃণায় এবং অপমানে, অভিমানে বিমর্ষ, অবসন্ন ও অধীর হইয়া পড়ে এবং সকলে মিলিয়া সেই সদ্যোজাতা নিরপরাধ শিশুটির প্রতি অভিসম্পাৎ করিতে থাকে।

ভাষা-তত্ত্ববিদরা 'দুখ্‌তর', 'মাদর' প্রভৃতি শব্দের উদাহরণ দিয়া কতিপয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষার সমতা, সমমূলকতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই প্রয়াসের ফলাফল এ ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য নহে। কিন্তু, এই সকল প্রাচীন ও সুসভ্য ভাষায় কন্যা ও নারীর জন্য সমবেতভাবে যে সকল শব্দের প্রচলন দেখা যায়, আমরা এখানে তাহার প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। ফার্সী ভাষায় কন্যাকে "দুখ্‌তর" বলা হয়,—উহা সংস্কৃত "দুঃখত্রয়"। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ তাপের আকর বা কারণ যে, সেই-ই দুঃখত্রয় বা দুখ্‌তর। সেকালে কন্যাদিগের প্রধান কাজ ছিল—গাভী দোহন করা,—তাই তাহার নাম হইল দুহিতা। সদা কামনার বশবর্ত্তিনী বলিয়া সে কন্যা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তনয়া ও পুত্রী মূলতঃ অসাধু প্রয়োগ। কারণ, পিতাকে পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করে এবং পিতার বংশ-বিস্তার করে বলিয়া পুরুষ-সন্তানকে যথাক্রমে পুত্র ও তনয় বলা হয়। সুতরাং ঐ শব্দগুলিকে বলপূর্ব্বক "আকারান্ত" করিয়া লওয়া সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ইংরাজীর Woman শব্দটাই sums up a long history of dependence and subordination বলিয়া ইংরাজ লেখকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। * ইহা ব্যতীত কামিনী, রমণী শ্রেণীর

* ব্রিটানিকা—Women.

যে সকল শব্দ আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার আভিধানিক বিশ্লেষণ করা সুরুচিসঙ্গত হইবে না।

এই আকাশ-পাতালব্যাপী শোচনীয় নির্ম্মমতার মধ্যে এছলাম— একমাত্র এছলামই—সূতিকা গৃহে প্রবেশ করিয়া দুন্য়ার ঘৃণিত উপেক্ষিত সেই সদ্যোজাত শিশুকে সাদরে ও সসম্ভ্রমে কোলে তুলিয়া লইতেছে। যাহার আগমনের অশুভ সংবাদে তাহার পিতা পর্য্যন্ত দুঃখিত, চিন্তিত এবং নিজকে বিপদগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতেছেন,—হতভাগিনী কন্যা-প্রসবের অপরাধ-চিন্তায় মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা যাইতেছেন—দুন্য়ার সকল কল্যাণের আকর এবং অন্যায়ের বৈরী এছলাম, তাহাকে সেই সময় সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছে,—সকলে তোমাকে পরিত্যাগ করিলেও তোমার "পরমপিতা" তোমাকে ত্যাগ করেন নাই। ঐ শোন, তাঁহার শাশ্বত বাণী তোমার সম্বন্ধে ঘোষণা করিতেছে :—

و اذا بشر احـد هم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم ج يتوارى
من القوم من سوء ما بشر به ط ايمسكه على هون ام يدسه فى
التراب - الاساء ما يحكمون - سورة النحل -

অর্থাৎ "এবং যখন তাহাদিগের মধ্যকার কাহাকেও কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া পড়ে, আর সে যেন মরমে মরিয়া যাইতে থাকে। এই সংবাদের অকল্যাণ হইতে (রক্ষা পাইবার জন্য) সে লোক-সমাজ হইতে আত্মগোপন করিতে থাকে। লজ্জা ও অপমান বহন করিয়া সে কন্যাটীকে গ্রহণ করিবে, না মাটির তলে তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে, (এই চিন্তায় তখন

* এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন : "রমণী কামিনী প্রভৃতি অতি ঘৃণিত শব্দ বৈদিক যুগে সৃষ্টই হয় নাই।" বঙ্গলক্ষ্মী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬।

তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে)। সাবধান! অতি কদর্য্য তাহাদের এই সিদ্ধান্ত।"—কোর-আন, ছুরা নহল।

এই শাশ্বত বাণীর বাহক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এ-সম্বন্ধে বলিতেছেন :

اذا وجد للرجل، ابنة بعث الله ملايكة يقولون السلام عليكم اهل البيت ! فيكسونها با جنحتهم و يمسحون بايديهم على رأسها و يقولون — ضعيفة خرجت من ضعيفة - القيم عليها يعان الى يوم القيامة -

অর্থাৎ—"মানুষের যখন কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, তখন আল্লাহ্ নিজের ফেরেশ্তাগণকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা আসিয়া বলেন,—গৃহস্থের কল্যাণ হউক। তাহার উপর নিজেদের বাহু দ্বারা কন্যাকে আবেষ্টন করিতে করিতে এবং সাদরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলেন,—এক অবলা অন্য এক অবলা হইতে বহির্গত হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাহার রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হইবে, কিয়ামত পর্য্যন্ত সে (আল্লার) সাহায্য লাভ করিতে থাকিবে।" এই হাদিছটী 'কনজুল ওম্মাল' (৮—২৭৬) হইতে গৃহীত। এই মর্ম্মের আরও কয়েকটা হাদিছ এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আল্লাহ্ ইচ্ছাময়, জ্ঞানময় ও মঙ্গলময়। কন্যা বা পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া সে ইচ্ছাময় ও জ্ঞানময় আল্লার মঙ্গল ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া, আর আল্লার জ্ঞানময়ত্ব ও মঙ্গলময়ত্বকে অস্বীকার করা একই কথা। কোর-আনের "শূ'রা" নামক ছুরায় আল্লাহ্ মানুষকে ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন :—

## এছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার

لله ملك السموات و الارض يخلق ما يشاء ط يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور لا او يزوجهم ذكرانا و اناثا ج و يجعل من يشاء عقيما ط انه عليم قدير ٥ - سورة الشورى -

অর্থাৎ—"স্বর্গ-মর্ত্তোর রাজত্ব একমাত্র আল্লারই অধিকারভুক্ত। (ইচ্ছাময় তিনি) যাহা ইচ্ছা সৃজন করিয়া থাকেন—যাহাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন, অথবা (যাহাকে ইচ্ছা) পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং (যাহাকে ইচ্ছা) বন্ধ্যা করিয়া দেন। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, সর্ব্বক্ষম।"—ছুরা শূরা।

এই আয়ত সম্বন্ধে প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, এখানে প্রথমে কন্যার এবং তাহার পর পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। আরবী ভাষার সর্ব্বজনবিদিত সাধারণ নিয়ম অনুসারে কন্যার কথা অগ্রে বর্ণনা করায় তাহাকে যে কোন প্রকারে হউক, একটা গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য দেওয়া হইতেছে। তফছিরকারগণের মধ্যে গুরুত্বের প্রকার নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, বর্ণনার এই বিশেষত্বকে মোটের উপর তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। সে যাহা হউক, এই আয়ত এবং নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য আয়তগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, কেবল এইরূপ ক্ষেত্রে কোর-আন পুত্রের পূর্ব্বে কন্যার এবং পুরুষের পূর্ব্বে নারীর উল্লেখ করিয়াছে। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধানের এবং দুনয়ার সাধারণ বর্ণনা প্রণালীর এই ব্যতিক্রম দ্বারা কোর-আন মানব-সমাজের সাধারণ ভাব-ধারাকে প্রতিহত করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, নারী,—নারী বলিয়া, আল্লার দৃষ্টিতে পুরুষ হইতে নিকৃষ্ট নহে। নারী নিকৃষ্ট, সুতরাং উৎকৃষ্টের পর তাহার উল্লেখ হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। ইচ্ছাময় আল্লাহ্, যে মঙ্গলময় ও রহমানুররহিম স্বরূপ, নারীর

মধ্য দিয়াও সেই স্বরূপের একদিকের অভিব্যক্তি হইতেছে। ইহা তাহাঁর নিকৃষ্টতা নহে—মঙ্গলময়ের নির্দ্ধারিত বিশেষত্ব। আয়তে দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, এখানে আল্লাহ্ মোহান্ধ মানবকে বুঝাইয়া বলিতেছেন,—কন্যা বা পুত্র লাভ করাতে তোমাদিগের ইচ্ছা বা শক্তির কোনই দখল নাই। স্বর্গ-মর্ত্ত্যের বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত বস্তু ও বিষয় একমাত্র যে রাজাধিরাজের অধিকারভুক্ত, তিনি ইচ্ছাময় এবং নিজ মঙ্গল ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ফলে-যাহাকে ইচ্ছা কন্যা এবং যাঁহাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন। অর্থাৎ পুত্র-কন্যার মালেক তোমরা নহ,—তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য এই পুত্র বা কন্যা তোমার নিকট গচ্ছিত আল্লার দান। কন্যাকে ঘৃণা করিলে মঙ্গলময় রহ্‌মানের এই রহ্‌মতের দানকে পায়ে ঠেলা হইবে।

এমরানের স্ত্রী, নিজ গর্ভস্থ সন্তানকে আল্লার নামে উৎসর্গ করিবেন বলিয়া মানস করিলেন। কিন্তু, কন্যা প্রসব করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন,—আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি, এখন কি করি! "কিন্তু, খোদা-তা-য়ালা সেই কন্যাকে অতি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন।" ছুরা আল-এমরানে মরয়মের এই উপাখ্যানটী বর্ণিত হইয়াছে। কন্যা শুচিতা ও পবিত্রতার হিসাবে বা অন্যপ্রকারে আল্লার হুজুরে উৎসর্গের অযোগ্যা, এই উপাখ্যানের বর্ণনায় এই ধারণার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। মরয়ম সাধনায় লিপ্ত হইয়া কিরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

কন্যার লালন-পালন সম্বন্ধে কয়েকটী হাদিছ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। হজরত বলিতেছেন:

١ من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو هكذا
وضم اصابعه - مسلم -

অর্থাৎ—"দুইটী বালিকাকে যে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত যত্নের সহিত লালন-পালন করিবে, সে আমার সহিত অভিন্নভাবে বেহেশ্‌তে অবস্থান করিবে।"—মোছলেম।

৩ من عال ثلث بنات او مثلهن من الاخوات فادبهن و رحمهن حتى يغنيهن الله اوجب الله له الجنة — فقال رجل يا رسول الله او اثنتين قال او اثنتين - حتى لو قالوا او واحدة لقال واحدة - مشكوة -

অর্থাৎ—"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তিনটী কন্যা বা তদনুরূপ ভগ্নীকে লালন-পালন করে, তাহাদিগকে সুশিক্ষা দান করে এবং তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করে;—তাহার পর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সৎপাত্রে ন্যস্ত করতঃ তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া দেয়—বেহেশ্‌ত তাহার পক্ষে ওয়াজেব বা নিশ্চিত হইয়া গেল। একজন ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হজরত! দুইটী কন্যার প্রতিপালকের সম্বন্ধে আপনার কিরূপ সিদ্ধান্ত?' হজরত তখনই বলিলেন,—'অথবা দুইটীর। এমন কি, আর কেহ একটী কন্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেও হজরত তাহার প্রতিপালককে এই প্রকার বেহশ্‌তের খোশখবর দিতেন।'—মেশকাত।

আর এক হাদিছে হজরতের শ্রীমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে:

من كانت له انثى فلم ياد ها ولم يهنها ولم يوثر ولده عليها يعنى الذكور ادخله الله الجنة - ابو داود -

অর্থাৎ—"যে কোন ব্যক্তির কন্যা ভূমিষ্ট হইলে সে তাহাকে পুতিয়া ফেলিল না, তাহাকে অপমানিত করিল না এবং তাহাকে উপেক্ষা করতঃ পুত্র-সন্তানের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল না, তাহাকে আল্লাহ্‌ বেহেশ্‌তে দাখিল করিবেন।"—আবু দাউদ।

হজরতের সময় আরব দেশেও কন্যা-হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। হজরতের স্বর্গীয় শিক্ষার ফলে, কোন প্রকার জোর জবরদস্তি ব্যতীত, তাহা অল্পদিনের মধ্যে আরব হইতে চিরকালের তরে উঠিয়া গিয়াছিল। কোর-আন, হাদিছ ও ইতিহাস ইহার নজির-প্রমাণে পূর্ণ হইয়া আছে। হজরতের উপদেশের ফলে অল্পদিনের মধ্যে আরব-সমাজে নারীর যে মর্য্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি উদাহরণও এই প্রবন্ধের শেষভাগে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইবে।

## (২) নারী—স্ত্রীরূপে

কামিনী-কাঞ্চণের সংশ্রবকে বিষবৎ জ্ঞান করিতে হইবে এবং সে জন্য এই দিন-রাত্রের "বাঘিনী-ডাকিনী"গুলির ত্রিসীমা হইতে লক্ষ যোজন দূরে পলায়ন করিতে হইবে—এছলাম এ-শিক্ষার এবং নারীর প্রতি এই অমর্য্যাদার আদৌ সমর্থন করে না। এছলাম নারীকে দেবীও বলে নাই, দানবীও বলে নাই। এছলাম বলিতেছে,—নারীও পুরুষের ন্যায় মানুষ। এছলাম নারীকে ভগবতীর অংশভূতাও বলে নাই, আবার নারী হওয়ার অপরাধে স্বয়ং "শ্রীভগবানের বাণী" শ্রবণের অধিকার হইতে তাহাকে চিরকালের তরে বঞ্চিত করিয়াও রাখে নাই। এছলাম বলিয়াছে—যেমন পুরুষ শ্রীভগবান নহে, তদ্রূপ নারীও শ্রীভগবতী নহে। তাহারা উভয়েই সেই প্রেমময়, মঙ্গলময় ও ইচ্ছাময় রহমানুর-রহিমের, সমান আদরের সৃষ্টি। আল্লার দেওয়া উপকরণ تقويم বা faculty-গুলির সদ্ব্যবহার করিতে করিতে এই বনি-আদম এত উচ্চে উঠিতে পারে, যাহার অধিক উচ্চতার কল্পনা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে, সেই সকল গুণ, বৃত্তি, শক্তি বা 'তাকভিমের' অব্যবহার বা অপব্যবহারের ফলে অধোগমন করিতে করিতে সে পতনের এমন ঘৃণিত স্তরে গিয়া

উপস্থিত হয় যে, শয়তান ও পিশাচেরাও যাহার কল্পনায় শিহরিয়া উঠে। এ-সম্বন্ধে নর ও নারী উভয়েরই অবস্থা অভিন্ন। পুরুষ বলিয়া তাহার কোন বিশেষ দাবী বা অধিকার নাই ; আর নারী বলিয়া তাহার কোন বিশেষ disqualification—অযোগ্যতা বা নিকৃষ্টতা নাই।

স্ত্রীরূপে নারী এছলামের নিকট হইতে কি মর্য্যাদা ও অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি, ক্রিয়া-কাণ্ড প্রচলিত সাধারণ প্রথা, শাস্ত্রীয় মন্ত্রাদি এবং বিবাহে নারীর সম্মতি ও অনুমতি গ্রহণের বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা আবশ্যক। বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, দুনয়ার বিবাহ সংক্রান্ত যে সব আদর্শ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কখনও কখনও গুরু গম্ভীর হিতোপদেশ শুনিতে পাওয়া গেলেও, বস্তুতঃ তাহার অন্তর্হিত সমস্ত ভাব-ধারা সমবেতভাবে বিবাহের দ্বারা নারীর দাসীত্বই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে এছলাম নারীকে বিবাহে সম্মত বা অসম্মত হওয়ার যে অপরিহার্য্য স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে, এবং বিবাহিত-জীবনে তাহার জীবনের স্বাধীনতাকে কার্য্যতঃ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, এই প্রবন্ধে আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাহারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

এছলাম বিবাহিত-জীবনে নারীর কি মর্য্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে, প্রথমে তাহার কয়েকটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। স্ত্রী সম্বন্ধে কোর-আন অতি সঙ্ক্ষেপে বলিয়া দিতেছে :

هن لباس لكم و انتم لباس لهن - سورة البقرة

অর্থাৎ—"স্ত্রীগণ তোমাদিগের পরিচ্ছদ এবং তোমরা হইতেছ তাহাদের পরিচ্ছদ।"—ছুরা বকূরা।

এই ছয়টা শব্দের সংক্ষিপ্ত আয়তে স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধের স্বরূপ কিরূপ সুন্দর ও ব্যাপকভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, পাঠকগণ এখানে তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। মানুষ পরিচ্ছদ পরিধান করে,—বাহিরের ধূলা-মাটির মলিনতা হইতে নিজকে নির্লিপ্ত রাখার জন্য, দুনয়ার শৈত্য বা উত্তাপ হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্য এবং সর্বোপরি নিজের শ্লীলতা রক্ষা ও লজ্জা নিবারণ করার জন্য। বিবাহিত নর-নারীর দাম্পত্য জীবন পরস্পরের নিমিত্ত পরিচ্ছদ হইয়া এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সফল করিতে থাকিবে। অধিকন্তু, এজন্য উভয়ের পক্ষে উভয়ের সমান আবশ্যকতা। এ-সম্বন্ধে পুরুষের কোন বিশেষ প্রাধান্য এখানে স্বীকৃত হইতেছে না। বরং, এই প্রাধান্য স্বীকারের যে ভাব-ধারা দুনয়াময় প্রচলিত আছে, স্বামীর অগ্রে স্ত্রীর উল্লেখ করিয়া কোর-আন স্পষ্টাক্ষরে তাহারও প্রতিবাদ করিতেছে।

কোর-আনের অন্যত্র বলা হইতেছে :

وعاشروهن بالمعروف ج فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا
شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ــ نساء

অর্থাৎ—"এবং তোমরা নিজ সহধর্ম্মিণীগণের সহিত সদ্ভাবে জীবন-যাপন করিতে থাকিবে। পরন্তু, তোমরা যদি তাহাদিগকে ঘৃণা কর—তবে, তোমরা এমন বস্তুকে ঘৃণা করিতেছ—প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাহাতে বহু মঙ্গল নিহিত রাখিয়াছেন।"—ছুরা নেছা।

স্ত্রী পাপের প্রস্রবণ নহে, বরং আল্লাহ্ তাহাকে বহু কল্যাণের আকররূপে দুনয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাকে ঘৃণা করিলে তোমার পক্ষে নিজের কল্যাণপুঞ্জকেই ঘৃণা করা হইবে। মুছলমানের বিশ্বাস,—কোর-আন আল্লার সাক্ষাৎ বাণী। তাহাতে বলা হইতেছে যে

স্থষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ্ স্বয়ং স্ত্রীর জীবনকে সংসার ও সমাজের জন্য অশেষ মঙ্গলের নিদানরূপে গঠন করিয়া দিয়াছেন।

নর ও নারী উভয়েই মঙ্গলময় আল্লার আদরের। ছনয়ার কল্যাণের জন্য উভয়কেই দৈহিক ও মানসিক হিসাবে কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দিয়া তিনি স্থষ্টি করিয়াছেন। উভয় বৈশিষ্ট্যের সদ্ব্যবহার এবং উভয়ের সাহচর্য্যের ফলে ছনয়ার দিকে দিকে তাঁহার সেই মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত হইতে থাকুক,—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু, উভয়ের মধ্যে কোন এক শ্রেণী যদি নিজের এই বৈশিষ্ট্যকে নিকৃষ্টতার নিদানরূপে গ্রহণ করে বা করিতে বাধ্য হয় এবং সে জন্য তাহারা যদি অপর শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যকে অর্জ্জন করার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহা হইলে নর ও নারীর স্বাতন্ত্র্য-স্থষ্টির মধ্যে আল্লার যে মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত রহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে একটা অনর্থক ও অস্বাভাবিক বিদ্রোহ উপস্থিত করা হইবে মাত্র। কোর-আন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদ করিয়া মানুষকে বলিয়া দিতেছে যে, নর ও নারীর এই যে স্বাতন্ত্র্য এবং তাহাদের প্রত্যেকের সাধনার এই যে বিশেষ প্রগতি, ইহার মধ্যে কোনটাই নিকৃষ্টতার নিদর্শন নহে। বরং প্রত্যেক শ্রেণীর এই বিশেষত্ব হইতেছে তাহাদিগের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ-দান বা 'ন্যায়মত'। যথাযথভাবে এই ছই বিশেষত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং যুগপৎভাবে যথাযথরূপে তাহার সম্মিলন সাধনের ফলেই ছনয়া স্বস্তি, শান্তি, আনন্দ ও পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া আল্লার মঙ্গল ইচ্ছার জয়জয়কার করিতে সমর্থ হইতে পারিবে। ছুরা নেছার আর একটী আয়তে বলা হইয়াছে:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ط للرجال
نصيب مما اكتسبوا ط وللنساء نصيب مما اكتسبن ط واسئلوا
الله من فضله ط ان الله كان بكل شيئى عليما o سورة النساء -

অর্থাৎ—"এবং ( হে নর-সমাজ ও নারী-সমাজ ! ) তোমাদিগের এক শ্রেণীকে আল্লাহ্ অন্যশ্রেণীর উপর যে আধিক্য ( বৈশিষ্ট্য ) দান করিয়াছেন, তাহা ( অন্যের সেই বৈশিষ্ট্য ) লাভ করার লালসা তোমরা কখনও করিও না। পুরুষের সাধনার বৈশিষ্ট্য পুরুষেরই উপযোগী এবং নারীর সাধনার বৈশিষ্ট্য নারীরই উপযোগী। ( নিজের বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন ও অন্যের বৈশিষ্ট্য অর্জ্জনের অনর্থক চেষ্টা না করিয়া ) তোমরা উভয়েই ( নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য ) আল্লার নিকট তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য্য সম্যকরূপে অবগত আছেন ( এবং সেই হিসাবে নর-নারীকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিশেষত্ব দিয়া সাধনার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন )"—ছুরা নেছা।

মানুষ হিসাবে নর-নারীর মর্য্যাদার এই সমতা স্পষ্ট ও অনাবিল ভাষায় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কোর-আন ইহাই বলিয়া দিতেছে যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর কতকগুলি "হক" বা ন্যায্য অধিকার আছে—এ কথা সত্য বটে ! কিন্তু, যুগপৎভাবে স্বামীর উপরও স্ত্রীর তাহার অনুরূপ কতকগুলি "হক" বা ন্যায্য অধিকার আছে। স্বামীর অধিকার অনুসারে তাহার উপর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত হইয়া থাকে এবং স্ত্রীও নিজের অধিকার অনুসারে নিজ কর্ত্তব্যপালনের জন্য দায়ী হয়। আমাদের বিশ্বাস, এছলাম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্ম বা সামাজিক আইন, আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীর অধিকারের এই সমতা এমন স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে নাই। কোর-আন আল্লার শাশ্বত বাণী। যুগে যুগে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ লইয়া ভুন্যায় যে উচ্ছৃঙ্খলা ও ব্যভিচার প্রচলিত হইতে পারে, তৎসমুদয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোর-আন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিতেছে যে, প্রকৃতির বিধান অনুসারে দেহের গঠন ও শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়া, নারী অপেক্ষা নর কতকটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে নারী অনেক সময় দৈহিক হিসাবে

এমন অশক্ত হইয়া পড়ে যে, পুরুষের ন্যায় শ্রমসাপেক্ষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এই শারীরিক শক্তি—vitality এবং গর্ভধারণ ও সন্তান-প্রসব প্রভৃতি কারণের দিক দিয়া নারীর তুলনায় পুরুষের যে একটা প্রাধান্য আছে, কোর-আন সে কথাও মানুষকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছে। এই প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া কোর-আন নারীর অমর্য্যাদা করে নাই, বরং স্বামীকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে শারীরিক শ্রম এবং উপার্জ্জন ও পরিবার-প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তোমার স্ত্রীও তাহার দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে অন্য প্রকারে বহু শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আল্লার মঙ্গল ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করিতেছে।

ছুরা বকরার একটী আয়তে স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের সমতা ও কর্ত্তব্যের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেওয়া হইতেছে :

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ص و للرجال عليهن
درجة - و الله عزيز حكيم - بقره -

অর্থাৎ—"স্ত্রীদিগের উপর সঙ্গতভাবে তোমাদিগের যে অধিকার, তোমাদিগের উপরও তাহাদিগের তদনুরূপ অধিকার এবং স্ত্রীর তুলনায় পুরুষের একপ্রকারের প্রাধান্য আছে। আর, আল্লাহ্ নিশ্চয় মহাক্ষমতা-শালী, প্রজ্ঞাময়।"—ছুরা বকরা, ১০৫ আয়ত।

কোর-আনে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে যে সকল বাস্তব ব্যবস্থা আছে, এই প্রবন্ধের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা পাঠকগণের খেদমতে উপস্থিত করার চেষ্টা করিব। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, কোর-আনের একটা দীর্ঘতম ছুরার নাম নেছা বা নারী এবং উহাতে বিশেষ করিয়া নারীর স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে বহু

আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বহু ছুরায় নারীর এই স্বত্বাধিকারের কথা নানা প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সময়াভাববশতঃ নারী সংক্রান্ত এছলামীয় আদর্শের সম্যক পরিচয় এইস্থলে প্রদান করা যে সম্ভবপর হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

স্ত্রীরূপে নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কি প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, এখন তাহার একটু পরিচয় দিয়া অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। হজরত বলিতেছেন :

১ اكمل المومنين ايمانا احسنهم خلقا - خياركم خياركم لنسايهم — ترمذى -

অর্থাৎ—"(মানুষের সহিত) ব্যবহারে যে ব্যক্তি যত উত্তম---ঈমানের হিসাব সে তত পূর্ণ এবং স্ত্রীর প্রতি তোমাদের মধ্যকার যাহার ব্যবহার যত অধিক সৎ—সে ব্যক্তিও তোমাদিগের মধ্যে তত অধিক সৎ।"—তিরমিজী।

২ انما النساء شقايق الرجال - احمد - ترمذى وغيره —

অর্থাৎ—"নারীগণ পুরুষদিগের অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বরূপ।"—আহমদ, আবু দাউদ প্রভৃতি।

৩ ليس من متاع الدنيا شيئى افضل من المراة الصالحة - مسلم - نسائى - ابن ماجه - احمد -

অর্থাৎ—"দুনয়ার উপকরণসমূহের মধ্যে সাধ্বী স্ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই।"—মোছলেম, নাছাই, এবনে মাজা, আহমদ।

৪ من تزوج فقد استكمل نصف الايمان - طبرانى -كنز العمال -

অর্থাৎ--"স্ত্রী গ্রহণ করিলে মানুষের (বাকী) অর্দ্ধেক ঈমান পূর্ণ হইয়া যায়।"—কনজ ৮-২৩৮।

ان الله جعلها لك لباسا و جعلك لها لباسا - ايضا

অর্থাৎ—"আল্লা তোমার স্ত্রীকে তোমার পরিচ্ছদ করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাকে তোমার স্ত্রীর জন্য পরিচ্ছদ করিয়া দিয়াছেন।" ঐ, ৮-২৫৪।

মুছলমানের জীবন-মরণের পুণ্যতম আদর্শ—গাজী বা শহীদ। সত্যের সহায়তা এবং অন্যায় ও অসত্যের মূলোৎপাটন করার জন্য যে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করে, এছলামের পরিভাষায় সেই হইতেছে—গাজী। আবার এই উৎসর্গীতপ্রাণ গাজী যখন অসত্যের সংঘাতে সেই প্রাণকে চিরতরে দান করে ফেলে, তখন, তাহাকে বলা হয়—শহীদ। নানা প্রাকৃতিক অসুবিধা ও দৈহিক দৌর্ব্বল্যের জন্য জীবন-মরণের এই পুণ্য আদর্শে নারী যথাযথরূপে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং গাজী ও শহীদের মর্য্যাদা হইতে নারীকে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে, বাহ্যতঃ এইরূপ মনে হয়। হজতের সময় কোন কোন নারী তাঁহার খেদমতে এই প্রকার অনুযোগ উপস্থিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহার উত্তরে হজরতের বহু সংখ্যক হাদিছের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা নিম্নে তাঁহার মধ্যকার একটী মাত্র হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

المرأة فی حملها الی وضعها الی فصالها کالمرابط فی سبیل الله
و ان ماتت فیما بین ذلک فلها اجر شهید — کنز العمال -

অর্থাৎ—"অন্তঃসত্তা অবস্থায়, প্রসব অবস্থায় এবং সন্তানকে দুগ্ধদানের অবস্থায় নারীর মর্য্যাদা ধর্ম্ম-সমরে চির সংযুক্ত গাজীর অনুরূপ। আর এই সকল অবস্থার মধ্যে যদি তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে সেই নারী শহীদের মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকেন।"—কন্‌জ ৮—২৬৮।

الا ان لكم على نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا —
ترمذی -

অর্থাৎ—"সাবধান ! তোমাদিগের স্ত্রীর উপরে তোমাদিগের অধিকার আছে এবং তোমাদিগের উপর তোমাদিগের স্ত্রীদিগেরও অধিকার আছে।"—তিরমিজি।

বিভিন্ন হাদিছের বর্ণনায় জানা যায় যে, হজরত পবিত্রতা ও মাধুর্য্যে নারীকে সুগন্ধির সহিত তুলনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, নারীদিগকে হজরত "কওয়ারির" বা কাচপাত্র বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। কাচ স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল এবং কঠোরতর সংঘাত সহনে অক্ষম। নিরক্ষর মোস্তফার এই দুইটী উপমায় নারীর মর্য্যাদা ও মাধুর্য্য কেমন সুন্দর ও কত স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়া যাইতেছে, চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাবর্গকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

## (৩) নারী—মাতারূপে

মাতৃভক্তি ও মাতৃসেবা সম্বন্ধে দুন্‌য়ার অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক মূল্যবান উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়া আছে। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, এছলাম এই প্রশ্নটীকে যে বিশেষত্ব দান করিয়াছে, অন্যত্র তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া সহজসাধ্য হইবে না। এছলামের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা তাওহিদ বা খাঁটী একেশ্বরবাদ। এই তাওহিদের শিক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া, কিরূপে রিক্ত, মুক্ত ও অনাবিলভাবে সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লার এবাদত 'বন্দেগী' বা পূজা-অর্চ্চনা করিতে হইবে, কোর্-আনের বহু স্থানে বিভিন্ন প্রকারে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য এবং তাঁহাদের সেবা সম্বন্ধে বর্ণিত আয়তগুলির

আলোচনা কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই শ্রেণীর বহু আয়তে আল্লাহ্ নিজের এবাদতের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে, অব্যবহিতরূপে, মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি ভক্তিমান, তাঁহাদের অনুগত ও সেবারত থাকার হুকুম প্রদান করিয়াছেন। ছুরা বকৃরা, ছুরা আনআম ও ছুরা বনি এছরাইলের এতৎসংক্রান্ত আয়তগুলি পাঠ অরিয়া দেখিলে, সাধারণ পাঠকগণ আমাদিগের কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত, ছুরা আন্কাবুত্ প্রভৃতিতেও এই বিষয়টী বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নমুনা স্বরূপ নিম্নে একটী মাত্র আয়ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ছুরা বনি এছরাইলে বর্ণিত হইয়াছে :

و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا ط اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلهما فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما و قل لهما قولا معروفا - و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا — سورة بنى اسرائيل -

অর্থাৎ—"এবং তোমার প্রভু আদেশ করিলেন যে, তুমি একমাত্র তাঁহার এবাদত ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। পিতা-মাতা বা তাঁহাদের মধ্যে একজন যদি তোমার নিকট বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিরক্তিজনক সামান্য একটু কথাও বলিও না, তাঁহাদিগকে ভৎ‍র্সনা করিও না, বরং তাঁহাদিগের সহিত সুসঙ্গত আলাপ করিবে এবং প্রেম-প্রসূত বিনয় সহকারে তাঁহাদিগের সমীপে অধঃনামিত হইয়া থাকিবে, আর ( প্রার্থনা করিয়া বলিবে ) হে প্রভু, যেমতে শিশু অবস্থায় ইঁহারা আমায় লালন-পালন করিয়াছেন, সেমতে তুমিও ইঁহাদিগকে নিজের করুণা দান কর।"

এই আয়তে আল্লাহ্ পিতা-মাতার আনুগত্যকে নিজের এবাদতের হুকুমের সঙ্গে একত্রভাবে বর্ণনা করিতেছেন। বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত পিতা-মাতার মানসিক অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায় এবং সেই সময় তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য যে ভক্তি ও ধৈর্য্যের আবশ্যক, আয়তে তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে। তাহার পর আয়তে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দ্বারা পিতৃ-মাতৃভক্ত সন্তানকে আর দুইটী গভীর তত্ত্বের কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। তাহার প্রথম কথা এই যে, সৃষ্টি ও পালনের একমাত্র মালেক যে আল্লাহ্—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাঁহার সৃষ্টি ও পালনের এই মহিমার প্রকাশ হয়, দুন্য়ার বিভিন্ন "আছবাব" বা উপলক্ষ উপকরণের মধ্য দিয়া। এক্ষেত্রে পিতা ও মাতাকে আল্লাহ্ নিজের প্রতিনিধি—"ছবব" বা উপলক্ষরূপে বর্ণনা করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ পিতা-মাতা বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত হইলে, শক্তি ও মানসিকতা উভয় দিক দিয়া তাঁহারা আবার যেন শিশুত্ব লাভ করেন। শিশুকালে তোমার কত ন্যায্য-অন্যায্য আব্দার সহ্য করিয়া – কত অহেতুক উপদ্রব ও কত অশিষ্ট ব্যবহার সানন্দে বহন করিয়া, তাঁহারা তোমাকে লালন-পালন করিয়া এত বড় করিয়াছেন। এখন সেই জরাজীর্ণ জনক-জননী তোমার শিশু-সন্তানরূপে পরিণত হইয়াছেন। সেই দৃষ্টিতে এখন তোমাকে তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, সেইভাবে সানন্দে তাঁহাদের সমস্ত আব্দার-উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে,—তবে, তোমার পিতৃ-মাতৃ ঋণ শোধ হইতে পারিবে। মাতৃভক্তির এমন কঠোর, ব্যাপক ও মহান আদেশ এবং তাহার কার্য্যকরণ পরম্পরার এমন সূক্ষ্ম, গভীর ও স্বর্গীয় বিশ্লেষণ আর কুত্রাপি পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

মাতার মর্য্যাদা সম্বন্ধে হজরত তাঁহার উম্মতকে যে উপদেশ দিয়াছেন.—সে সম্বন্ধে তিনি দুন্য়ার যে অনুপম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন,

তাহার বিস্তারিত পরিচয় দিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার আবশ্যক হইয়া পড়িবে। হজরত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—"মাতার অসন্তোষ উৎপাদন মহা পাপ। আল্লাহ্—গফুরর্ রহিম,—সমস্ত মহাপাতকের ক্ষমা তিনি করেন। কিন্তু, মাতৃদ্রোহের মহাপাতকের ক্ষমা তিনি করেন না এবং মাতৃদ্রোহী এই জীবনেই নিজের পাপের দণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হয়।"—মেশকাত।

একজন ছাহাবী আসিয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহার খেদমত করা আমার কর্ত্তব্য?" হজরত বলিলেন,—"তোমার মাতার।" ছাহাবী পুনরায় বলিলেন,—"তাহার পর?" হজরত বলিলেন,—"তোমার মাতার।" ছাহাবী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর?" হজরত উত্তর করিলেন,—"তোমার মাতার। ছাহাবী আবার বলিলেন,—"তাহার পর? হজরত বলিলেন,—"তাহার পর তোমার পিতার এবং তাহার পর পর্য্যায়ক্রমে আত্মীয় স্বজনের।"—বোখারী, মোছলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ।

বিবি হালিমা বেদুঈন গোত্রের একজন সাধারণ স্ত্রীলোক। শৈশবকালে হজরত তাঁহার স্তন্যপান করিয়াছিলেন,—তাই হালিমা হজরতের দুধ-মা। হজরত ছাহাবাগণকে লইয়া মজলিসে বসিয়া আছেন, এমন সময় হালিমা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। হজরত অন্য কাহাকে কিছু না বলিয়া নিজে উঠিলেন, নিজের গায়ের চাদর বিছাইয়া দিয়া হালিমাকে লইয়া তাহার উপর বসাইলেন।—আবু দাউদ।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, ইহা হোনেন যুদ্ধের পরের কথা এবং উল্লিখিত দরবারে হজরতের প্রধান প্রধান খলিফা ও ছাহাবাগণের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এ হেন সময়ে,—এ হেন দরবারে, হজরতের রেদা-মোবারকের উপর আসন-প্রাপ্তির ন্যায় মর্য্যাদা মুছলমানের চোখে আর কিছুই হইতে পারে না।

একদা জনৈক ভক্ত আসিয়া হজরতকে বলিলেন,— "আমি জেহাদে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি এবং সে জন্য আপনার পরামর্শ চাই।" হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার মা কি বাঁচিয়া আছেন?" ছাহাবী বলিলেন,—"হাঁ।" হজরত তখন বলিলেন,—"যাও, তন্ময় তদ্গত হইয়া মায়ের সেবায় প্রবৃত্ত হও।" নিশ্চয় জানিও,—

ان الجنة عند رجلها ـ

অর্থাৎ—"স্বর্গ, মাতার চরণ সন্নিধানে অবস্থিত।"—আহমদ, নাছাই, বাইহাকী।

আনাছ বলিতেছেন,—হজরত বলিয়াছেন:

الجنة تحت اقدام الامهات - خطيب مرقا

অর্থাৎ—"স্বর্গ, মাতার চরণ তলে অবস্থিত।"—খতিব, মেশকাতের টীকা হইতে গৃহীত।

একজন ছাহাবী আসিয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্তানের উপর পিতা মাতার হক্ কিরূপ?" হজরত উত্তরে বলিলেন:—

هما جنتك و نارك ـ

অর্থাৎ—"পিতা-মাতা তোমার স্বর্গ এবং তাঁহারাই আবার তোমার নরক।"—ইব্‌নে মাজা।

ইব্‌নে ইম্‌রান নামক ছাহাবী হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আমি এক মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছি, তাহার কি কোন তাওবা আছে?" হজরত বলিলেন,—"তোমার মা বাঁচিয়া আছেন কি?" ইব্‌নে ইম্‌রান বলিলেন,—"না, তিনি বাঁচিয়া নাই।" হজরত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাতার সহোদরা—খালা?" ছাহাবী বলিলেন,—"হাঁ, আমার খালা বাঁচিয়া আছেন।" হজরত বলিয়া দিলেন,—"যাও, সেই

খালার খেদমত করিতে থাক।”—অর্থাৎ ইহাতেই তোমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।—তিরমিজী।

এছলাম নারীকে সম্মান ও গৌরবের যে উচ্চ আসনে সমাসীন করিয়াছে, উপরে অতি সঙ্ক্ষেপে তাহার আভাষ দিয়াছি। কিন্তু, ইহাই যথেষ্ট নহে। যে বাচনিক সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নারীকে তাহার খোদা-দত্ত অধিকারগুলি ভোগ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই, তাহা অনর্থক শব্দ বিন্যাস এবং প্রবঞ্চনামূলক কপট মর্য্যাদা-প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যাড়ম্বরের চটকে সরল প্রকৃতি নারীকে তাহার স্বাভাবিক স্বত্ত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখার জন্য—উহা একটা সফল ষড়যন্ত্র মাত্র। অতএব, এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে এছলাম নারীর কি অধিকার স্বীকার করিয়াছে এবং সমাজের বুকে তাহাকে কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদিগের বিশ্বাস, নারীর মর্য্যাদা সংক্রান্ত এছলামের অনুপম আদর্শের বিশেষত্ব এইখানেই গৌরবে ও মহিমায় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে।

## এছলামে নারীর অধিকার

দুন্‌য়ার সকল শিক্ষা ও সকল সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থিত—আরব দ্বীপে, দীর্ঘ চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে, তাহার নিরক্ষর নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা—এছলাম ধর্ম্মের প্রচার করেন। দুন্‌য়ার কোন আইন-কানুন তিনি জানিতেন না,—কোন শাস্ত্র-ব্যবস্থা তিনি অবগত ছিলেন না। অধিকন্তু, তাঁহার স্বদেশে ও স্বসমাজে নারী সম্বন্ধে যে অনাচার তখন সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল, তাহার উল্লেখ করিতেও মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এই অবস্থায় এবং এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে,

প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে নারীর জন্য তিনি যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল অপূর্ব্ব ও অনুপমই নহে,—বরং সঙ্গে সঙ্গে তাহা পূর্ণ চরম ও শাশ্বত ব্যবস্থা। মনুষ্যত্বের সাধনায় এবং সত্যকার সভ্যতায় বিশ্ব-মানব যে দিন চরম সাফল্য লাভ করিবে, সেদিনও তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে—আরবের নিরক্ষর নবীর ব্যবস্থাই সকল দিকের সমস্ত হিসাবে চরম পরম ও পূর্ণতম আদর্শ। নারীর মর্য্যাদা, নারীর স্বাধীনতা ও নারীর অধিকার লইয়া ইয়োরোপ আজ যে কোলাহল তুলিয়াছে, অধিকারের মানদণ্ডে তুলিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, নারীর অধিকারের এই ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও আজও ইয়োরোপ এছলামী আদর্শের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। নারীর অশ্লীল ও উলঙ্গ চিত্র মুদ্রিত করায়, অথবা, রঙ্গালয়ে মড-এলেন জাতীয়া নারীদিগের উলঙ্গ নৃত্য দর্শনে, নারীকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না,—সম্মানও করা হয় না। সম্মানের প্রকৃত প্রমাণ—তাহার অধিকার-স্বীকারে; আর অধিকার-স্বীকারের প্রধান পরীক্ষাস্থল—দায়ভাগ বা উত্তরাধিকার আইন। ইয়োরোপের এই আইনগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তন্মধ্যে, চরম সভ্যতার দাবীদার ইংরাজ জাতির আধুনিক সংশোধিত বিধি-ব্যবস্থাগুলির পর্য্যালোচনা করিলে এবং এছলামের উত্তরাধিকার আইনের সহিত তাহার তুলনায় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, উভয়ের মধ্যকার আকাশ পাতাল প্রভেদ সহজেই ধরা পড়িয়া যাইবে। চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে দুনয়ার বিভিন্ন সভ্যতা ও বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র নারীকে যে "অধিকার" দিয়া রাখিয়াছিল, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা হওয়া উচিত। অন্যথায় এছলামের প্রতি অবিচার করা হইবে—একথা আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছি, তাহার একটা গুরুতর কারণ আছে।

ইয়োরোপ অজ্ঞানতা ও অন্ধবিশ্বাসে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সে জ্ঞানের স্বাদ পাইল, সভ্যতার আদর্শ দর্শন করিল—মুছলমানের সংশ্রবে আসার পর। আরব-গুরুগণের খেদমতে নতজানু হইয়া, ইয়োরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার রীতি, নীতি শিক্ষা করিয়াছিল—এ কথা সকলেই জানেন এবং অনেকে স্বীকারও করেন। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জানা যাইবে যে, মুছলমানের সহিত শত্রু বা মিত্ররূপে সাহচর্য্য ঘটার সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ইয়োরোপ—সমস্ত খৃষ্টান-জগৎ, নারীকে খোদার সাক্ষাৎ অভিশাপ এবং দানবী, পিশাচীরূপে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। * নারী যে আত্মাবিশিষ্ট একটা জীব, গণ্যমান্য সমাজপতি ও ধর্ম্মনায়কগণ প্রকাশ্য সভা করিয়া তাহা অস্বীকার করিতেন। কিন্তু, মুছলমানের সংশ্রবে আসার পর, তাহারা চকিত, মোহিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল—নারীর এক সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। সে চিত্র প্রেমে-পুণ্যে নয়নাভিরাম,

* Compare St. Augustin :—"What does it matter whether it be in the person of mother or sister, we have to beware of Eve in every woman".—রমণী মাতৃরূপিণী হউক বা ভগ্নিরূপিণী হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না; আমাদের প্রত্যেক রমণীকে ঈভের প্রতিবিম্ব মনে করিয়া সাবধান হইতে হইবে।

ইয়োরোপের প্রসিদ্ধ লাটিন ধর্ম্মযাজক টারটুলিয়ান নারীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "Thou art at the devil's gate, the betrayer of the Tree, the first deserter of the Divine Law"—নারী শয়তানের দ্বারী, বিশ্বাসঘাতিনী, স্বর্গীয়-আইন সর্ব্বপ্রথম ভঙ্গকারিণী।

সেণ্ট য়্যাণ্টনি, জেরোম, গ্রেগেরি, সিপ্রিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মাচার্য্য নারী জাতিকে এইভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন: The organ of devil—নারী শয়তানের অঙ্গ, মুখপাত্র ;—the gate of devil—শয়তানের দ্বার ; the road of iniquity—দুর্নীতির প্রশ্রয়দাত্রী ; scorpion ever ready to sting—সর্ব্বদা দংশনকারী বৃশ্চিক ; the poison of asp, the malice of dragon—ফণিনীর গরল ; the instrument which the devil uses to gain possession of our souls—মনুষ্য হৃদয়কে পাপাসক্ত করিবার যন্ত্র।

মহিমায়-গরিমায় উজ্জ্বল এবং স্বর্গের আশীর্ব্বাদে উদ্ভাসিত। মুছলমান-দিগের এই সাহচর্য্যের পর হইতে—এবং একমাত্র এই সাহচর্য্যের ফলে—সমাজ-সংস্কারের মধ্য দিয়া নারীর দুরবস্থার অনুভূতি তাহাদিগের মধ্যে একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। ফলে, ইয়োরোপে নারীর অবস্থার যতটুকু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে এবং ইয়োরোপের অনুকরণে প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির মধ্যে আজ নারীর অধিকার যতটুকু স্বীকৃত হইতেছে—তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এছলামেরই কল্যাণদান। এ কথাগুলি কাহারও কাহারও নিকট হয়ত নূতন বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু, নূতন হইলেও ইহা অনাবিল সত্য। *

## দায়ভাগে নারীর অধিকার

এই প্রবন্ধের প্রথম হইতে আমরা নারীকে কন্যা, স্ত্রী ও মাতারূপে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। কারণ, ইহাই হইতেছে,—নারীর স্বরূপ প্রকাশের তিনটী মৌলিক অবস্থা। এখন আমরা এই হিসাবে নারীর উত্তরাধিকারের বিষয় আলোচনা করিব। এই আলো-চনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বিহিত-ভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতে স্বামী ধর্ম্মতঃ বাধ্য,—এমন কি, অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতে ইহা বিবাহের একটা আবশ্যকীয় শর্ত্ত।

এছলামের দায়ভাগ আইনে প্রথম শ্রেণীর অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী বারজন,—তাহার মধ্যে আটজন স্ত্রীলোক ও চারিজন পুরুষ।

---

* এই গুরুতর বিষয়টী লইয়া বিস্তারিত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের জ্ঞানান্বেষী শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে কাহাকেও Special Subject রূপে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে যারপর নাই সুখী হইব।

কন্যা, মাতা ও স্ত্রী এছলামের ব্যবস্থায় কস্মিনকালে কোন অবস্থায় পিতা, পুত্র ও স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন না।

সন্তান থাকিলে স্ত্রী ৴০ আনা এবং নিঃসন্তান অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে, স্ত্রী তাহার রমস্ত সম্পত্তির চারি আনা রকম উত্তরাধিকারী পাইয়া থাকেন।

মৃত ব্যক্তির পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে প্রত্যেক কন্যা প্রত্যেক পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবেন, অন্যথায় এক কন্যা থাকিলে পিতার সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক, একাধিক হইলে ২/৩ অংশ সেই কন্যাগণের প্রাপ্য হইবে।

মাতা তাহার সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে অবস্থা ভেদে এক তৃতীয়াংশ বা এক ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নারীগণও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর সকল প্রকারের "নির্ব্যূঢ়" স্বত্বে স্বত্বাধিকারিণী হইয়া থাকেন এবং ইচ্ছা মত তাহা ভোগ দখল ও দান-বিক্রয়াদি করিতে পারেন।

জীবন-স্বত্ব বলিয়া কোন কথা এছলামী দায়ভাগে নাই। নারীগণের উত্তরাধিকার লাভের পর সে সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিরূপে গণ্য হইয়া যায় এবং তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর সে সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়—তাঁহাদের ওয়ারেছগণ।

নারীদিগের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আজও দুনয়ার বিভিন্ন আইন-কানুনে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন ও শর্ত্তাদির বজ্রবাঁধন দেখিতে পাওয়া যায়। এছলামে তাহার একটু স্থান নাই। এছলাম নারীকে পিতা, পুত্র, স্বামী ও ভ্রাতার পরিত্যক্ত তাঁহাদিগের পৈতৃক, স্বোপার্জ্জিত, রেস্ত টাকা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রকারের যাবতীয় স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির উপর পুরুষ উত্তরাধিকারীদিগের সমান স্বত্বাধিকারের মালিক করিয়া দেয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নারীর মূল্য ও মর্য্যাদার পরিমাণ নির্ণয় করিতে

হইবে, তাহার প্রাপ্ত স্বত্বাধিকারের মধ্য দিয়া। অর্থাৎ যে ধর্ম্ম নারীর প্রাপ্য স্বত্বাধিকারের ন্যায্য দাবী যে পরিমাণে স্বীকার করিয়াছে,—সে ধর্ম্ম-সমাজের চোখে নারীর মূল্য ও মর্য্যাদা তত অধিক। আর এই অধিকার-দানের বাস্তব পরীক্ষা-ক্ষেত্র হইতেছে—সম্পত্তি। আমরা উপরে সঙ্ক্ষেপে সে অধিকারের যে পরিচয় দিয়াছি, অভিজ্ঞ পাঠকগণ দুন্‌য়ার সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক আইন-কানুন ও শাস্ত্রব্যবস্থার সহিত এছলামের সেই উদার বিধানগুলির তুলনা করিয়া দেখুন, তাহা হইলে তাহার অনুপমতার মহিমা তাঁহারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

## বিবাহে নারীর অধিকার

বিবাহ এছলামের এক অতি সৎ, অতি মহৎ এবং অতি পবিত্র স্বর্গীয় অনুষ্ঠান। পুরুষ, নারীর পাণিগ্রহণ করে—আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া, তাঁহাকে জামিন দিয়া। অর্থাৎ পুরুষ, আল্লার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হয় এবং তাহার সেই প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া—পুরুষ সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিবে বলিয়া—আল্লাহ স্বয়ং পুরুষের পক্ষ হইতে জামিন হন, আর জামিন স্বরূপে তিনিই স্বয়ং নারীকে লইয়া পুরুষের হাতে সমর্পণ করেন। বিবাহ ও নারীর মর্য্যাদা সংক্রান্ত বহু শাস্ত্রীয় বচনে এছলামী বিবাহের এই স্বরূপ অতিশয় উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদেশের অনেকের ধারণা—মুছলমানের বিবাহ, একটা সামাজিক চুক্তি বা Civil Contract ব্যতীত আর কিছুই নহে। Mohammadan Law নামে প্রচলিত আইন পুস্তকগুলির দ্বারা এই সম্পূর্ণ মিথ্যা ভাবটাকে দেশময় সংক্রামিত করা হইয়াছে। কিন্তু, ইহা একটা স্বতন্ত্র সন্দর্ভ এবং ভবিষ্যতে স্বতন্ত্রভাবে ইহার আলোচনা করিয়া এছলামী বিবাহের প্রকৃত স্বর্গীয় স্বরূপটা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করার চেষ্টা পাইব।

বিবাহ্ নারীর একমাত্র জীবন-মরণ সমস্যা এবং এই সমস্যার অনুকূল বা প্রতিকূল সমাধানের উপর তাহার বাস্তব জীবন ও বাস্তব মরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং কাহাকে জীবন সঙ্গীরূপে গ্রহণ করিয়া সে সুখী হইতে পারিবে, না পারিবে, সে বিষয়ে মত প্রকাশ করার অধিকার তাহার থাকা চাই,—বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে আইনে সে মতের একটা মর্য্যাদা ও গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়া চাই। আর, কেবল সুনীতির হিসাবে নহে—বরং অপরিহার্য্য ধর্ম্মবিধানের ও অবশ্য প্রতিপাল্য আইনের হিসাবেও তাহার একটা মূল্য থাকা চাই।

দুনয়ার সমস্ত শাস্ত্র-ব্যবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর,—এ অধিকারের খোঁজ-খবর কোথাও পাইবে না। বরং সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে—ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত এক নির্ম্মম চিত্র। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইয়াছেন—খুবই হালে। সুতরাং তাঁহাদিগের কথা আজ আর আলোচনা না করিয়া শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে,—তাঁহাদিগের শাস্ত্র-ব্যবস্থা নারীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে নাই, কোন একটা সামান্য অধিকার দিয়াও তাহার অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা পায় নাই। প্রাচীন সভ্যজাতি পারসিকেরা তখন মজদকীয় শিক্ষায় মোহিত হইয়া زن—"জন্" বা নারীকে জর্ ও জমিনের ন্যায় পুরুষের সাধারণ উপভোগ্য ও যদৃচ্ছা ব্যবহার্য্য একটা তৈজস পাত্রে পরিণত করিয়াছিল। তথা-কথিত বিবাহের কোন বাঁধও সেখানে ছিল না। যে কোন পুরুষ ইচ্ছ করিলে যে কোন সময় যে কোন নারীকে উপভোগ করিতে পারিত। তাহাতে অমত করার বা বাধা দিবার একবিন্দু অধিকারও তখন নারীর ছিল না। বিবাহে নারীর মতামতকে হিন্দু স্মৃতি কস্মিনকালেও কোন মূল্য প্রদান করে নাই। তাহার আট প্রকার বিবাহের শ্রেষ্ঠ হইতেছে—ব্রাহ্ম বিবাহ, দৈব বিবাহ, আর্য্য বিবাহ ও

প্রজাপত্য বিবাহ। এই সকল স্থানে নারীর মতামত দিবার কোনই অধিকার নাই এবং আইনে সে মতামতের কোনও মূল্য নাই। একজন ব্যক্তির আবশ্যক হইল—দৈববলে একটা মতলব সিদ্ধি করিয়া লওয়ার। আর সে জন্য তিনি 'জ্যোতিষ্টোম' বা ঐ রকমের আর একটা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। শাস্ত্র বলেন,—"যজ্ঞের পুরোহিতকে যদি এই সময় একটা "অলঙ্কৃতা কন্যা" দান করা হয়, তাহা হইলে যজ্ঞের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার খুব সম্ভাবনা হইয়া থাকে।" এরূপ ক্ষেত্রে কর্ম্মকর্ত্তা দৈবকার্য্য-সিদ্ধি-কামনায় পুরোহিতকে যে কন্যাদান করেন, তাহারই নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। ফলে, এখানেও হয় দান—না হয়, বিনিময়ের ব্যবস্থা এবং তাহার একমাত্র মালেক পুরুষ কর্ম্মকর্ত্তা। নারীর তাহাতে 'না' বলার কোনও অধিকার নাই,—বলিলেও "লোক ধর্ম্ম" তাহা শুনিতে আদৌ বাধ্য নহে। তাহার পর আসুর বিবাহ হইতেছে—দস্তুরমত কন্যা-বিক্রয়। গান্ধর্ব্ব বিবাহকে বিবাহ বলিলেও পাপ হয়—বস্তুতঃ ইহা ব্যভিচারের শুদ্ধিকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নারীর আত্মীয়-স্বজনকে দস্তুরমত খুনজখম করিয়া যে "রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনা হয়"—সেও পুরুষের বিবাহিতা স্ত্রী! স্মৃতির পরিভাষায় ইহাকে বলা হয়—রাক্ষস বিবাহ। ইহা ব্যতীত পৈশাচ বিবাহ আছে। যাঁহার দরকার হয় যথাস্থানে ইহার ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য্য দেখিয়া লইবেন,—আমরা অপারক। যাহা হউক, দুনিয়ার কোনও শ্রুতি, কোনও স্মৃতি এবং কোনও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা নারীকে তাহার এই জীবন-মরণ সমস্যায় নিজের স্বাধীন মত অনুসারে কাজ করার কোনও অধিকার দান করেন নাই। কিন্তু, এছলাম নারী-সমাজকে এই বিপদের পাথার হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার ন্যায্য অধিকারগুলিকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে—ইহাকে চিরস্থায়ী ও অপরিহার্য্য আইনে পরিণত করিয়া

দিয়াছে। ইহার দুই একটী মোটামুটি নজির এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহাকে অবিলম্বে পাত্রস্থ করার তাকিদ বহু হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে। না-বালেগা কন্যার বিবাহ দিবার আদেশ বা তৎসংক্রান্ত বিশেষ কোন বিধিব্যবস্থা—আমাদের সামান্য জ্ঞান অনুসারে—কোর-আনে বা হাদিছে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, অবস্থাবিশেষে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়া অসিদ্ধ না হইলেও, তাহা এছলামের আদর্শ নহে।

বিবাহের দ্বারা নর-নারীর মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর পরও সে সম্বন্ধ বাকী থাকে,—পরকালেও তাহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্রে বেহেশ্‌তের আনন্দ উপভোগ করিবে—কোর-আন ও হাদিছে এসব কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, যে কাজের দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর এই পবিত্র সম্বন্ধের বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, অবস্থা বিশেষে এছলামে তাহার ব্যবস্থা থাকিলেও, তাহা অগত্যা পক্ষের আপদ্ধর্ম্ম। অপরিহার্য্য অন্যায়রূপে শরিয়তে তাহার অনুমতি মাত্র দেওয়া হইয়াছে—তাহা এছলামের আদর্শও নহে, অভিপ্রেতও নহে।

বয়ঃপ্রাপ্তা না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃহীনা বালিকার বিবাহ দেওয়া সিদ্ধ নহে। ইহা কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্ট ব্যবস্থা। অধিকাংশ এমাম ও আলেম এই মতের সমর্থন করেন। যাঁহারা ইহার সমর্থন করেন না, তাঁহারাও বলেন যে, দাদা ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয় এতিমার বিবাহ দিলে, বালেগা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সে কোন অজুহাত বা যুক্তি প্রমাণ না দেখাইয়া স্বেচ্ছাক্রমে নিজে সে বিবাহ অস্বীকার করিতে পারে। দাদা সম্বন্ধে এই বর্জ্জিত বিধির সমর্থনে—ফারাএজ সংক্রান্ত কিয়াছ ব্যতীত—কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহাদিগের নিকট বিদ্যমান আছে

বলিয়া লেখকের জানা নাই। সে যাহা হউক, যে বিবাহ বজায় রাখা বা ভাঙ্গিয়া ফেলার সম্পূর্ণ অধিকার নারীর আছে, তাহার মূল্য যে কতটুকু, —পাঠক তাহা দেখিতেছেন।

শেষোক্ত দলের মতকেই সঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাহার সার এই দাঁড়াইবে যে, পিতৃহীনা কন্যাকে কেহ বিবাহ দিলেও সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া ফেলার সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে।

বিধবা হউক, কুমারী হউক, বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে পিতারও কোন অধিকার নাই। সাক্ষী প্রমাণ ও অন্যান্য শর্ত্তগুলি পালন করতঃ কন্যা পিতার অনুমতি না লইয়া, এমন কি, তাঁহার সম্পূর্ণ অমতে, যে কোন পুরুষকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিতে পারে। পিতা তাহাতে কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারেন না এবং সে জন্য কন্যার উপর কোন প্রকার দোষারোপও করা যাইতে পারে না। কারণ, সে শরিয়তের দেওয়া অধিকার ভোগ করিতেছে মাত্র! ইহা এমাম আবু হানিফা ছাহেবের ও হানাফী মজহাবের গৃহীত অভিমত। এই মতাবলম্বীরা নিজেদের মতের সমর্থনে বহু দলিল ও নজির উদ্ধার করিয়া থাকেন।

অন্যান্য আলেম ও এমামগণ বলেন যে, কুমারী বা বিধবা কন্যার অমতে বা আদৌ মত না লইয়া কোন পিতাও যদি তাহার বিবাহ দেন, তাহা হইলে সে বিবাহ যে অসিদ্ধ তাহাতে একবিন্দুও সন্দেহ নাই। কারণ, পরস্পরের—উভয় বর ও কন্যার সম্মতিই হইতেছে বিবাহের প্রধানতম উপাদান। তাহার পর ঠিক বিবাহের সময় formal ভাবে কন্যাদিগের "এজেন" বা অনুমতি না লইলেও বিবাহ সিদ্ধ হয় না,—ইহাও সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। বিবাহে উকীল ও সাক্ষী রাখিতে হয়—এই সম্মতিদানের প্রমাণ স্বরূপে। কিন্তু, এ-সমস্ত স্বাধীনতা ও অধিকার

থাকা সত্ত্বেও নারী পিতার অনুমতি লইতে বাধ্য। "অলির অনুমতি ব্যতীত কোন বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে না"—এই মর্ম্মের প্রমাণ কোর্‌আন ও হাদিছ হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইঁহারাও নিজ মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারাও বলেন যে, কোন অলি যদি নারীর ক্ষতিজনকভাবে তাহার বিবাহে অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে কাজীর নিকট দরখাস্ত করিয়া নারী সে অনুমতি লাভ করিতে পারে। শাস্ত্রীয় প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রধাণতম যুক্তি এই যে, সংসারের কুটিলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা কুমারী তরুণী, বয়স-ধর্ম্মের মোহ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধা—অথবা দুষ্ট চঞ্চলমতি ও নীচ স্বার্থপরায়ণ পুরুষগণের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বসিতে পারে। নারীকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য পিতা প্রভৃতি অলিগণের মত লইয়া কাজ করার ব্যবস্থাও হইয়াছে। অন্য পক্ষেরা যুক্তির হিসাবে বলেন—বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর নারী—তা সে কুমারী হউক বিধবা হউক বা বিবাহিতা হউক—নিজের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের, ভোগ তছরফের, দান-বিক্রয়ের সম্পূর্ণ মালেক হইয়া যায়, এবং সে সময় তাহাকে পিতা বা স্বামীর কোন প্রকার অনুমতি লইতে আইনতঃ বাধ্য করা হয় নাই। সম্পত্তি সম্বন্ধে নারীকে যে অধিকার ও যে স্বাধীনতা দেওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, বিবাহ সম্বন্ধে তাহাকে সে অধিকার ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করার কোনই কারণ নাই।

এই মতবাদগুলির সমালোচনা করা এক্ষেত্রে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। বিবাহ বন্ধনে এছলাম নারীকে কি প্রকার অধিকার ও কি পরিমাণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে, সে বিষয়ের সমস্ত দিক পাঠক পাঠিকার সম্মুখে পরিস্ফুট করার জন্য আমরা এতগুলি কথার অবতারণা করিয়াছি। রক্ষণশীল দলের এমামগণও বিবাহে নারীর যে অধিকার

স্বীকার করিয়াছেন, এই আলোচনায় তাহাও পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে। কুমারী হউক, বিধবা হউক, তাহার স্পষ্ট অভিমত না লইয়া কোন 'অলি'—এমন কি তাহার পিতাও—তাহাকে বিবাহ দিবার অধিকারী নহেন, ইহা সকল পক্ষের সর্ব্ববাদীসম্মত অভিমত।

অন্য 'অলির' কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং পিতাই যদি কন্যার অমতে তাহার বিবাহ দেন, তাহা হইলে কন্যা ইচ্ছা করিলে তখনই সে বিবাহকে অস্বীকার ও অমান্য করিতে পারে। স্বয়ং হজরত রছুলে করিম বিভিন্ন ঘটনায় এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার হুকুমে এই শ্রেণীর কতকগুলি বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণের জন্য এখানে দু'টি মাত্র হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

عن ابن عبـــاس قال ان جارية بكـــرا اتت رسول الله صلعـــم فذكـــرت ان اباها زوجها و هى كارهـــة فخيرها النبى صلعـــم —
— ابو داود -

অর্থাৎ—"এবনে আব্বাছ বলেন, একটি কুমারী কন্যা হজরতের নিকটে আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিবাহ দিয়াছেন, অথচ সে বিবাহে তাঁহার অমত। হজরত তাঁহাকে স্বাধীনতা দিলেন (অর্থাৎ বলিয়া দিলেন যে, ইচ্ছা করিলে তুমি এ বিবাহ বজায় রাখিতে পার, আর ইচ্ছা করিলে উহা 'বাতিল' করিয়া দিতে পার।" এবনে মাজা, আবু দাউদ প্রভৃতি।

عن عايشة رض ان فتاة قالت يعنى للنبى صلعم ان ابى زوجنـــى من ابن اخيـــه ليرفع بى خسيسته و انا كارهـــة فارسل النبى صلعـــم الى ابيها فجاء فجعل الامر اليها فقالت يـــا رسول الله

انی قد اجزت ما صنع ابی و لکن اردت ان اعلم للنساء ان لیس للاباء من الامر شیئ - النسائي - تیسر الوصول -

অর্থাৎ—"বিবি আয়েশা বলিতেছেন—এক তরুণী হজরতের নিকটে আসিয়া বলিলেন—ভ্রাতুষ্পুত্রের নীচ ব্যবহার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পিতা তাহার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন—অথচ আমার ইহাতে অমত। তখন হজরত তাহার পিতাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ঐ তরুণীকে বলিয়া দিলেন—তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা করিলে তুমি এই বিবাহ বহাল রাখিতে পার, ইচ্ছা করিলে তাহা অস্বীকার করিতেও পার। তরুণী তখন বলিতে লাগিলেন—হজরত! পিতার কার্য্যে আমি অনুমতি দিলাম। তবে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া আমি নারী সমাজকে জানাইয়া দিতে চাহিয়াছি যে, (কন্যার উপর) পিতাদিগের কোনও প্রকার অধিকার নাই।"—নাছাই, তাইছির।

হানাফী মজহাবের প্রাচীনতম ও প্রধানতম এমাম শামছুল আয়েম্মা ছরখছী এই হাদিছের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

و لم ینکر علیها مقالتها رسول الله صلعم - المبسوط - ٥-٢

অর্থাৎ—"অথচ হজরত যুবতীর এই উক্তির কোনও প্রতিবাদ করিলেন না।"—আল মবছুত ৫—২ পৃষ্ঠা।

এমাম ছাহেব এই যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিতেছেন যে, হাদিছের শেষ ভাগে বর্ণিত যুবতীর অভিমতটিও হাদিছরূপে গণ্য। কারণ ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত মৌনাবলম্বন দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়াছেন। তাহাতে একটুও অন্যায় থাকিলে হজরত নিশ্চয়ই তাহার প্রতিবাদ করিতেন। অছুলকারগণের পরিভাষায় ইহা

'তকরিরী-হাদিছ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহা সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে প্রত্যক্ষ হাদিছ বলিয়া পরিগণিত।

এমাম বাইহাকি ও হাফেজ এবনে হাজর শাফেয়ী মতবাদের সমর্থনের আগ্রহাতিশয্য বশতঃ প্রথম হাদিছটীর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, 'গয়ের কফুতে' বিবাহ দিবার কারণে তাহা ভঙ্গ করার অনুমতি* দেওয়া হইয়াছিল। 'বলুগুল মরামের' টীকাকার আমির মোহাম্মদ বেন এছমাইল বলিতেছেন যে, ইহা শাফেয়ী মজহাবের সমর্থনের জন্য এই এমামদ্বয়ের আগ্রহাতিশয্যের ফল। বস্তুতঃ তাঁহাদের উক্তির কোনও প্রমাণ নাই। (ছোবলুছ ছালাম, আওনুল মা'বুদ ২—১৯৫) আমাদিগের মতে ইহা শুধু প্রমাণহীন কথা নহে, বরং প্রমাণের বিপরীত কথা। অন্যান্য আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় হাদিছটীর প্রতি নজর করিলেই আমাদের কথার সত্যতা স্পষ্টতঃ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে। কারণ এই হাদিছে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, পিতা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলের এবং হজরত সেই বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার কন্যাকে দিয়াছিলেন। 'কফুর' প্রচলিত মছলাকে নির্ভুল বলিয়া ধরিয়া লইলেও, আপন চাচাত ভাইকে কেহই "গয়ের কফু" বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন না।

বিবাহ সংক্রান্ত মতভেদগুলির সূক্ষ্ম সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে,—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এখানে আর একটা প্রসঙ্গে দুই একটা কথা না বলিলে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

বিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এক এরাকের পণ্ডিতগণ ব্যতীত (আওনুল মা'বুদ ২—২০৫) অন্যান্য সকলে সাধারণভাবে স্বীকার করিতেছেন যে, পিতা যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার

বিবাহ দেন, তবে সে কন্যার আর উদ্ধার নাই। কোনও অবস্থায় সে বিবাহ ভঙ্গ করার কোনও অধিকারই আর তাহার থাকে না। আমরা এরাকীয় পণ্ডিতগণের মতকেই সঙ্গত এবং কোরআন হাদিছের সমস্ত দলিলের ভাব ও ভাষার সহিত সমঞ্জস বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ, অন্য পক্ষের নিকট এমন কোন বিশেষ দলিল নাই, যাহা দ্বারা তাঁহারা সন্তোষজনকরূপে সপ্রমাণ করিতে পারেন যে,—অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হওয়ার পর অন্য সমস্ত 'অলি' দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবাহকে অস্বীকার করিতে পারে বটে, বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী কন্যা পিতার দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবাহকেও অমান্য করিতে পারে বটে, কিন্তু পিতা শত অন্যায় করিয়াও অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলে, সে বিবাহ ভঙ্গ করার কোন অধিকার তাহার কস্মিনকালে ও কোন অবস্থাতেই বর্ত্তিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির হিসাবে বিচার করিয়া দেখিলে সহজে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এছলাম বিবাহ সম্বন্ধে নারীকে যে অধিকার ও স্বাধীনতা দান করিয়াছে, এবং তাহার মূলে যে উদার, মহান ও স্বাভাবিক 'নীতি' নিহিত রহিয়াছে, এই মতবাদটী সে নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

অপরিণতবয়স্কা বালিকার বিবাহ দেওয়া যে এছলামের আদর্শ নহে—একথা আমরা পূর্ব্বেই আরজ করিয়াছি। বিবি আয়েশার বিবাহ-বিবরণ আমাদিগের অবিদিত নহে। এই হাদিছ সংক্রান্ত সূক্ষ্ম আলোচ্য বিষয় অনেক আছে,—এক্ষেত্রে তাহার বিচারের স্থানাভাব। আজ এই প্রসঙ্গে, মোটের উপর শুধু এই কথাটা বলিয়া রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, হজরতের বিবাহ ও তাঁহার বিবিগণের বিষয়ে এমন অনেক ব্যবস্থা আছে, মুছলমান সাধারণের জন্য যাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না।

হজরতের শিক্ষাগুণে এবং তাঁহার সময় সত্যকার এছলামী ব্যবস্থার

মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে লালিত পালিত হওয়ার ফলে, নিজেদের দাবী প্রকাশ ও অধিকার-প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে মোছলেম তরুণীরাও যে কিরূপ সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই সকল হাদিছের দ্বারা তাহাও স্পষ্টতঃ প্রকাশ হইয়া যাইতেছে।

বিবাহ-বন্ধন ছেদ করা সম্বন্ধে এছলামে আরও যে সব বিধি ব্যবস্থা আছে, এই প্রসঙ্গে সম্যকরূপে তাহারও বিচার করা আবশ্যক। নচেৎ আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আবার সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, তালাকের মছলার সকল দিকের বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য উপস্থিত আমরা সে আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হইলাম। আল্লাহতাআলা শক্তি দিলে, ভবিষ্যতে এই ত্রুটি পূরণের চেষ্টা করিব। তবে পাঠকগণকে আজ এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, আজকাল মুছলমান সমাজ সাধারণতঃ তালাকের অধিকারের যে প্রকার অপব্যবহার করিতেছে, তাহা এছলামের আদর্শ নহে,—বরং তাহার বিপরীত একটা ঘৃণিত বেদ্‌আত্‌ ও অশাস্ত্রীয় ব্যভিচার মাত্র। পক্ষান্তরে এখানে ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, যেমন বিশেষ বিশেষ কারণে ও বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বিশেষ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের কঠোর তাকিদ সহকারে স্বামীকে অগত্যা স্ত্রীত্যাগের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ কারণে এবং বিশেষ বিশেষ সতর্কতার তাকিদ্‌ সহকারে এছলাম নারীকেও বিবাহ-বন্ধন ছেদ করার অধিকার প্রদান করিয়াছে। পুরুষ স্মার্ত্তগণের বহু শতাব্দীর নেকনজরের ফলে, শরিয়তের মূল ব্যবস্থাগুলি স্থানে স্থানে চাপা পড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এছলামের মূল উৎস—আল্লার কালাম ও রছুলের হাদিছকে চাপা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। স্বাধীনভাবে

তাঁহার আলোচনা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মোছলেম-জগতের সুধীবৃন্দ আবার তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। সম্প্রতি মিসরের পার্লামেণ্টে বিবাহ ও তালাক সম্বন্ধে নূতন আইনের যে খষড়া পেশ হইয়াছে, তাহা আমাদিগের কথার সত্যতার সাক্ষাৎ প্রমাণ।

আমাদিগের দেশে সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে যে, পুরুষের স্ত্রীবর্জ্জনের অধিকার কোন নিয়ম কানুনের অনুশাসন মানিতে বাধ্য নহে। পক্ষান্তরে একাধিক স্ত্রীগ্রহণ করারও তাহার নিয়মহীন, শর্ত্তহীন অবাধ অধিকার আছে। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে, মুছলমান সমাজ—বিশেষতঃ ধার্ম্মিকতার সোল এজেন্সীর দাবিদারগণ—স্ত্রীবর্জ্জন ও একাধিক স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার যে ঘোর ঘৃণাজনক ব্যভিচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতেও বুক ফাটিয়া যায়। মিসরের পার্লামেণ্ট বলিতেছেন,—স্ত্রীবর্জ্জন ও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতিকে এছলাম যে সকল নিয়ম কানুনের কড়া অনুশাসনের অধীন করিয়া দিয়াছে, এখন কেবল ধর্ম্মের খাতিরে কেহ আর সেগুলিকে মান্য করিয়া চলে না। কাজেই, কোরআন ও হাদিছ স্ত্রীবর্জ্জনের ও একাধিক স্ত্রীগ্রহণের যে সকল শর্ত্ত নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাকেও আইনে পরিণত করিতে হইবে। এই আইনের ফলে, দরখাস্তকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, বস্তুতঃ শরিয়তের নিয়ম কানুন অনুসারে সে স্ত্রীবর্জ্জনের বা একাধিক স্ত্রীগ্রহণের অধিকারী। অন্যথায় তাহা আইন গ্রাহ্য হইবে না। বরং অবস্থা বিশেষে পুরুষকে দেশের ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের বিধান অনুসারে অর্থদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। লোকের অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষকে এছলাম প্রদত্ত অধিকার ভোগ করিতে দেওয়ার পূর্ব্বে, তৎসংক্রান্ত অপরিহার্য্য বিধি ব্যবস্থা ও শর্ত্তগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য করার জন্য, মোছলেম জগতের প্রত্যেক আবশ্যকীয় কেন্দ্রে এই

শ্রেণীর আইন কানুন প্রণীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কারণ, ঐ সকল অনুমতির সহিত এই সর্ত্তগুলির অবিচ্ছেদ্য যৌগপতিক সম্বন্ধ। পূর্ব্বকার মুছলমানগণ স্বাভাবিক ধর্ম্মভীরুতা ও পরহেজগারীর জন্য নিজেরাই ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত শর্ত্ত মান্য করিয়া চলিতেন—কেহ না মানিলে কাজী, মুফতী প্রভৃতি খলিফার প্রতিনিধিগণের নিকট তাহার প্রতিকারের দাবী করা চলিত। কিন্তু আজকাল, বিশেষত আমাদিগের দেশে, সমস্ত শর্ত্ত ও সমস্ত নিয়ম লোপ পাইয়াছে—আছে কেবল স্ত্রীবর্জ্জনের অধিকার, আছে কেবল একাধিক স্ত্রীগ্রহণের অনুমতি।

আজকাল অনেক মুছলমান ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হওয়ার জন্য বহু অর্থ ও শ্রমের সদ্ব্যয় বা অপব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কি মিসরের অনুকরণে বিবাহ-সংক্রান্ত আইনের সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করিতে পারেন না? কেহ এজন্য প্রস্তুত হইলে আমরা তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হাজির আছি। ইহার জন্য ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করার আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোছলেম লীগ, জমইয়তে ওলামা ও অন্যান্য মোছলেম প্রতিষ্ঠানগুলিকে এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা একটা নূতন কাণ্ড-কারখানা উপস্থিত করিতে বলিতেছি না। আমরা বলিতেছি—কোরআন ও হাদিছ স্ত্রীবর্জ্জন ও একাধিক স্ত্রীগ্রহণকে, যে নিয়ম কানুন ও শর্ত্তাদির সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে, মুছলমান আইনে দুই তিনটা ধারা যোগ করিয়া সেগুলিকেও আইনে পরিণত করিয়া দিতে। জানি না, এই দুর্ব্বল কণ্ঠের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ মুছলমান সমাজে কোন প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিতে পারিবে কি না?

নারীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ভারতীয় মুছলমান সমাজের—সমাজের সরিফ ও পরহেজগার লোকদিগের—মধ্যে প্রচলিত

বর্ত্তমান অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ার বিশেষ আবশ্যক ছিল। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ও বিস্তারিত রূপে ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া তাহাও এখন স্থগিত রাখিতেছি। আমাদিগের মতে,—এই পর্দ্দার অনুকূলে কোনও দলিল নাই,—বরং কোরআন, হাদিছ, 'খাইরুল কোরুন' বা স্বর্ণযুগের ইতিহাস, সমগ্র মোছলেম জগতের অতীত ও বর্ত্তমান আচার, একবাক্যে ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রবন্ধে যে কয়েকটা হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও পাঠকগণ প্রকৃত অবস্থার কতকটা সন্ধান পাইতে পারিবেন। প্রবন্ধের উপসংহার ভাগেও তাঁহারা বর্ত্তমান অবরোধ-প্রথার বহু প্রতিকূল নজির দেখিতে পাইবেন। তবে এখানে পাঠকগণকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এছলাম যেমন ভারতীয় মুছলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত বর্ত্তমান অবরোধ-প্রথার সমর্থন করে না—ঠিক সেইরূপ ইউরোপের বীভৎস সভ্যতার বর্ত্তমান স্বরূপের এবং সমস্ত সুনীতি ও শ্লীলতার বিপরীত তাহার এই নারকীয় নগ্ননর্ত্তনের সমর্থনও এছলামে নাই। এছলামে স্বাধীনতা আছে—উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় নাই, অধিকার আছে—ব্যভিচার নাই, নারীর মুক্তি আছে—মুক্তির নামে বুভুক্ষু কামকুক্কুরগণের নীচ স্বার্থপ্রণোদিত প্রচ্ছন্ন বিলাসবৃত্তির পৈশাচিক পিপাসা নাই।

দুন্‌য়ার সকল ধর্ম্মের সমস্ত স্মার্ত্ত, সকল সমাজের যাবতীয় ব্যবস্থা-প্রণেতা নারীর মর্য্যাদা-হানি ও তাহার অধিকার খর্ব্ব করার নিমিত্ত সমবেতভাবে যে ধারাবাহিক চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সম্যক আলোচনা করিলে ক্ষোভে ও লজ্জায় ম্রীয়মান হইয়া পড়িতে হয়। তাহারা নারীকে পার্থিব সকল সম্মান, সকল গৌরব ও সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারেন নাই—ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই; এক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষপাতমূলক সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারজনিত মানসিক

বিকার স্বর্গের সিংহাসনকে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেও চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তাই দেখিতেছি—স্বর্গের সমস্ত করুণা, সমস্ত আশীর্ব্বাদ একমাত্র পুরুষের ভাগ্যে সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া হইয়া আছে, নারীর তাহাতে কোন প্রাপ্য অধিকার নাই। এমন কি, যে নারী ভগবতীর সাক্ষাৎ অংশ স্বরূপা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত,—ভগবতীর বা ভগবানের পূজা অর্চ্চনা করার, তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করার, তাঁহার বাণীর একটী বর্ণ মুখে উচ্চারণ করার, এমন কি কাণে শ্রবণ করার অধিকারও সে নারীর নাই।

এই পক্ষপাতমূলক সঙ্কীর্ণতার এবং এই অজ্ঞতাজনিত মহাপাতকের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করিয়াছে—এছলাম। নারীর মহিমাকীর্ত্তনে এবং তাহার সমস্ত ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করণে কোরআনের এক বিরাট অংশ পর্য্যবসিত হইয়া আছে! কোরআনের একটি বৃহৎ অধ্যায়ের নাম 'নেছা' বা নারী,—আর একটীর নাম 'মরয়ম' বা মেরী। এছলামকে সাক্ষাৎভাবে অধিক লেনা-দেনা করিতে হইয়াছিল—এহুদী ও খৃষ্টান সংস্কারের সহিত। তাই কোরআন এক্ষেত্রে এহুদী ও খৃষ্টান সমাজের পুরাবৃত্ত হইতে কতিপয় সতীসাধ্বী এবং আল্লার বিশেষ আশীর্ব্বাদ ও প্রেরণা-প্রাপ্তা মহিলার কথা উল্লেখ করিয়া এহুদীদিগের হঠকারিতার কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছে। হাজেরা, ছারা, মরয়ম, বিলকিছ, আছিয়া প্রভৃতি সাধ্বী মহিলাগণের উপাখ্যানে স্পষ্ট করিয়া নারীর মর্য্যাদা ও আল্লার হুজুরে তাহার সম্মান ও অধিকারের কথা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল বর্ণনার দ্বারা কোরআন খুব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে যে, নর ও নারী উভয়ই মঙ্গলময় আল্লাহ্‌তা'আলার মঙ্গল সৃষ্টি,—তাঁহার করুণা ও তাঁহার প্রেমে, তাহাদের উভয়েরই সমান

অধিকার আছে। সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ পরিণত করার জন্য, যে যে বিশেষ উদ্দেশ্যে তাহাদিগের প্রত্যেককে যে যে বৈশিষ্ট্য দান করা হইয়াছে, সেই সেই বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়া তাহারা পরস্পরের সাহচর্য্যে সেই সেই লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হউক—ইহাই স্বর্গের মঙ্গল ইঙ্গিত। এই হিসাবে কোরআন স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছে যে, পুরুষদিগের ন্যায় নারীগণও "নবী" হইতে পারেন। কেবল হইতে পারেন-ই নহে,—বরং নারীরাও যে 'নবুয়ত' লাভ করিয়াছেন, কোর-আনের অনাবিল ভাষা স্পষ্টভাবে ও সমুচ্চ কণ্ঠে জগদ্বাসীর নিকট তাহা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট কথাটা নিতান্ত অভিনব বলিয়া মনে হইতে পারে। তাই এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটা দরকারী কথার উল্লেখ করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছি।

যে সকল মহামানব আল্লার নিকট হইতে 'অহি' ও 'কালাম' বা প্রেরণা ও বাণী প্রাপ্ত হইতে থাকেন, এছলামের পরিভাষায় তাঁহাদিগকে "নবী" বলা হইয়া থাকে। এই নবীগণের মধ্যে যাঁহারা সেই বাণীকে বিশ্ব-মানবের নিকট প্রচার করিতে, দুন্‌য়ার প্রচলিত শয়তানের রাজ্যে সত্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে এবং তজ্জন্য কঠোর কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হইয়া থাকেন, সেই নবীগণকে বলা হয়—রছুল। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, আল্লার বাণী ও প্রেরণালাভের সম্পর্ক যতটুকু, সেখানে নবী ও রছুলের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। তারতম্য ঘটিয়াছে—বাহিরের কর্ম্মযোগের বিশেষ সাধনার হিসাবে। তাই বলা হয়—সমস্ত নবী রছুল না হইলেও, রছুলগণ সকলেই নবী।

পুরুষের ন্যায় নারীকেও আল্লাহ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সেগুলি হইতেছে তাহার প্রকৃতিগত স্বর্গীয় অবদান।

স্বর্গের সকল প্রেম ও সকল করুণা, নারীর মহিমা ও গুরুত্বকে এইখানেই মনের সাধ মিটাইয়া একেবারে ষোল কলায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নারী রছুল-জীবনের কঠোর কর্ম্ম-সংগ্রামের সীমা হইতে দূরে অবস্থান করিতে বাধ্য—প্রকৃতিকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধনায় তাহার পথ সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন। তাই নবুয়তের দরজা লাভ করা তাহার পক্ষে অন্যায়ও নহে, অসম্ভবও নহে। আমাদের জ্ঞানবিশ্বাস মতে,—এই কারণে কোরআন ও হাদিছে কোন নারী রছুলরূপে বর্ণিত হন নাই বটে, - কিন্তু নারীর নবী হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ তাহাতে বিদ্যমান আছে। পাঠক পাঠিকাগণের কৌতুক নিবারণের জন্য নিম্নে উহার সামান্য একটু আভাব দিয়া রাখিতেছি।

(১) কোরআনের ছুরা মরয়ম পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে—সেখানে জাকরিয়া, য়্যাহয়া ও এবরাহিম প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় নবীদিগের বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং সেই সকল বর্ণনার পূর্ব্বে و اذكر فى الكتاب পদটী যোগ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের মধ্য ভাগে বিবি মরয়মের নামের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাতে পূর্ব্ব কথিত মতে—و اذكر فى الكتاب مريم বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। এই দুই কারণে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, কোরআন এখানে বিবি মরয়মকে নবীদিগের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছে।

(২) এই ছুরায় হজরত জাকরিয়া, বিবি মরয়ম, হজরত এবরাহিম, হজরত এছমাইল ও হজরত ইদ্রিছ প্রভৃতির ইতিবৃত্ত বর্ণনার পর স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে :—

اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين ذرية آدم -

অর্থাৎ—"আদম-বংশের যে সকল নবীর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন—ইঁহারা তাঁহাদিগের অন্তর্ভূক্ত।"

সুতরাং বিবি মরয়মও যে হজরত এবরাহিম ও হজরত ইদ্রিছ প্রভৃতির ন্যায় আল্লার 'এনআম' প্রাপ্ত নবীদিগের অন্তর্ভূক্ত, অর্থাৎ তিনিও যে একজন নবী, তাহা অকাট্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়া যাইতেছে।

(৩) কোরআনে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, বিবি মরয়ম, হজরত মুছার মাতা, হজরত এছহাকের মাতা প্রভৃতির নিকট আল্লাহ নিজের "রুহ" অর্থাৎ জিব্রাইল ফেরেশতাকে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা আল্লার "অহি" বা প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন,—স্বর্গের সুসংবাদ তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইয়াছিল, এবং 'অহির' মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহারা বহু অজ্ঞাত তথ্য ( আম্বাউল-গ'এব ) অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(৪) স্বনামখ্যাত মহামনীষী এমাম এবনে হাজম তাঁহার 'মিলাল' ( ملل و نحل ) গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে نبوة النساء বা নারীর নবুয়ত নাম দিয়া একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এমাম ছাহেব সেখানে কোরআনের বহু যুক্তিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অকাট্যরূপে নারীর নবুয়ত সপ্রমাণ করিয়াছেন। বিপক্ষ দল এই প্রসঙ্গে যে সকল যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করিতে পারেন, এমাম ছাহেব সেগুলির উল্লেখ করতঃ সম্পূর্ণভাবে তাহার খণ্ডনও করিয়া দিয়াছেন। *

---

* ৩৮৪ হিজরীতে স্পেনের কর্ত্তবা বা কর্ডোভা নগরে এমাম ছাহেবের জন্ম হয় এবং ৪৫৬ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। ( এব্‌নে খল্লকান )। এমাম ছাহেবের এই 'মিলাল' পুস্তকখানি দুনয়ার সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মমতের সূক্ষ্ম সমালোচনামূলক এক বিরাট বিশ্বকোষ। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দুনয়ার সকল দেশের সকল ধর্ম্মমতের ও তাহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় শাখা প্রশাখাগুলির সঠিক বিবরণ এমন ব্যাপকভাবে সঙ্কলন, তাহার এমন অকাট্য সূক্ষ্ম ও দার্শনিক সমালোচনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত সাধারণ অন্ধবিশ্বাসের উপর এমন তীব্র রুদ্র ও বেপানাহ আক্রমণ, বাস্তবিকই একটা অসাধারণ ব্যাপার।

এছলামের প্রাথমিক ইতিহাস সম্যকরূপে আলোচনা করিলে তৎকালীন মোছলেম-নারী-সমাজ সম্বন্ধে এমন অনেক গৌরবজনক তথ্য অবগত হওয়া যায়, যাহার কল্পনা করাও বোধ হয় এখন সাধারণ মুছলমানগণের, এমন কি তাহাদের আলেম ও হাদী সমাজের অনেকের পক্ষেও সহজ সাধ্য হইবে না। হাদিছের দার্শনিক সমালোচনা অর্থাৎ 'রেওয়ায়তের' সহিত 'দেরায়তের' সমাবেশ করতঃ হাদিছের আভ্যন্তরীণ দিকের সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে, আজকাল সাধারণ আলেম সমাজের অশেষ তিরস্কারভাজন হইতে হয়। হাদিছের কথা দূরে থাকুক, আরবী ভাষায় লিখিত থার্ডক্লাস বাজে গল্প-পুস্তকের একটা তা-হদ্দ গাঁজাখুরি কথার প্রতিবাদ করিতে গেলেও প্রথমে নেচারি-নাস্তিক, বেদিন-কাফের প্রভৃতি বিশেষণগুলি হজম করার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিতে হয়। কিন্তু হজরতের সময় এবং তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে মুছলমানের মানসিকতার অবস্থা এরূপ ছিল না। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শিক্ষামাহাত্ম্যে আরবের নারীগণও তখন পুরুষ পণ্ডিতগণের সহিত এ সকল বিষয় লইয়া অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন; এবং পাঠকগণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, অনেক সময় এই সব বিদুষী মহিলার উক্তিই ছাহাবী সমাজে যুক্তি সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইত। হজরত ওমরের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত খলিফা মছজিদে-নববীর মেম্বরে দাঁড়াইয়া খোত্‌বা দিতেছেন,—শত শত ছাহাবা স্তব্ধ মুগ্ধ এবং নিরব নিস্পন্দ ভাবে তাহা শুনিয়া যাইতেছেন। এমন সময় তিনি প্রসঙ্গক্রমে নারীদিগকে চারিশত দেরমের অধিক মোহর দিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন—হজরতের সময় কাহারও ইহার অধিক মোহর নির্দ্ধারিত হয় নাই—ইহাই ছিল হজরত ওমরের প্রধান যুক্তি।

মজলিসের এক প্রান্ত হইতে অমনি একটী নারীকণ্ঠ গম্ভীর স্বরে ধ্বনিয়া উঠিল :—

"আমিরুল মোমেনিন! ক্ষান্ত হউন! এ প্রকার আদেশ দিবার কোন অধিকার আপনার নাই।"

"কারণ?"

"কারণ—আল্লার কোরআন। আপনি কি পড়েন নাই, আল্লাহ বলিতেছেন—"তোমরা যদি কোন স্ত্রীকে 'কিন্তার' বা অগাধ ধন সম্পদ মোহরস্বরূপে দান করিয়া থাক, তালাক দিবার সময়, তাহার এক কপর্দ্দকও ফিরাইয়া লইতে পারিবে না।" (ছুরা নেছা) 'কিন্তার' বা অগাধ ধন সম্পদ যে স্ত্রীকে মোহর স্বরূপে প্রদান করা যাইতে পারে, এই আয়ত তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

সত্যসন্ধ ওমরের চৈতন্য হইল—তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন—"তোমাদের খলিফা ভ্রান্ত হইয়াছিল,—এই নারীর কথাই ঠিক, বস্তুতঃ ইহাই এছলামের বিধান। এই মহিলা সংশোধন করিয়া না দিলে আজ ওমরের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। তোমরা সকলে শ্রবণ কর,—পুরুষ ওমর ভ্রান্ত,—আর এই মোছলেম-মহিলার কথাই ঠিক।" শত শত উদাহরণের মধ্যে ইহা একটা সাধারণ নমুনা মাত্র।

এই প্রসঙ্গে বিবি আয়েশার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের মতে 'রেওয়াতের' সূক্ষ্ম ও দার্শনিক সমালোচনার ভিত্তি মোছলেম-কুল-জননী বিবি আয়েশাই সর্ব্বপ্রথমে স্থাপন করিয়াছেন। হাদিছের আলোচনায় নানা উপলক্ষে দেখা যায়, বিশিষ্ট ছাহাবীগণ হজরতের হাদিছ বলিয়া এক একটা বিবরণ প্রদান করিতেছেন, আর বিবি আয়েশা নানাবিধ শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাহা টুকরা টুকরা করিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। ছহি মোছলেমের একটী

হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বনামধন্য ছাহাবী এবনে ওমর জনৈক সদ্য বিয়োগ বিধুর আত্মীয়ের মুখে ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া একজন লোক পাঠাইয়া তাহাকে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। নিষেধের সময় তিনি বলেন—আমি হজরতের মুখে শুনিয়াছি যে, আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দনের জন্য মৃত ব্যক্তির উপর আজাব হইয়া থাকে।

এবনে ওমরের ন্যায় একজন পরম পরহেজগার ও মহা পণ্ডিত ছাহাবী হজরতের নামে এই হাদিছের 'রেওয়ায়ত' বর্ণনা করিতেছেন, আর বিবি আয়েশা এই 'রেওয়ায়ত' শ্রবণ মাত্র জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—"আল্লার দিব্য, হজরত কখনও এরূপ কথা বলেন নাই যে, অপর একজনের কৃত কর্ম্মের জন্য অন্য এক ব্যক্তি দণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।" বিবি আয়েশা তখন মুছলমানদিগকে দুইটী কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন :—

(১) যাঁহাদের নিকট হইতে তোমরা হাদিছ গ্রহণ করিয়া থাক, সেই ছাহাবীগণ কখনই মিথ্যাবাদী নহেন। তবে মানুষের অনেক সময় শ্রবণ-বিভ্রম ঘটিয়া থাকে, এ সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইতে হইবে।

(২) এছলামের মূল নীতির বিপরীত কোন হাদিছই হজরতের বাণী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এছলামের মূল নীতি এই যে, আল্লাহ্ ন্যায়বান ও 'আদেল'। তাই কোরআন বলিয়া দিতেছে—لا تزر وازرة وزر اخرى —'একজনের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করিবে না।' এবনে ওমরের এই হাদিছটী এছলামের এই মূল নীতির বিপরীত, সুতরাং 'রাবীর' ব্যক্তিত্বের বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রথমেই উহাকে তাঁহার শ্রুতি-বিভ্রম বলিয়া নির্দ্ধারিত করা উচিত।

বিবি আয়েশা এইরূপ সূক্ষ্ম যুক্তির হিসাবে ছাহাবীদিগের বর্ণিত আরও কতিপয় হাদিছকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।

"হজরত চর্ম্ম চক্ষে আল্লাহকে দর্শন করিয়াছিলেন,"—"হজরত যাহা বলেন, বদর যুদ্ধের শহিদগণ সে সমস্তই শুনিতে পান"—ইত্যাদি হাদিছগুলির কথা উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মে'রাজ সম্বন্ধেও বিবি আয়েশা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, "মে'রাজের রাত্রে হজরতের শরীর তাঁহার শয্যা হইতে এক মুহূর্ত্তের তরেও তিরোহিত হয় নাই—উহা সত্যময় 'স্বপ্নযোগ' ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

প্রাথমিক যুগের মোছলেম মহিলাগণের জ্ঞান-চর্চ্চার নানা দিককার বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিতে হইলে, সেজন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার আবশ্যক হইবে। এই স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনারও স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা এই প্রবন্ধে নানা প্রসঙ্গে যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য আপাততের মত তাহাই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আশা করি।

এছলামের শিক্ষা মাথায় করিয়া সে কালের মোছলেম মহিলাগণ মানসিক বলে ও দৈহিক শৌর্য্যে-বীর্য্যে কিরূপ অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই দিগ্বিজয়ী বীর জননীগণের অনুপম কীর্ত্তিগাঁথাগুলি মোছলেম জগতের জীবন-ইতিহাসের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সোনার অক্ষরে লিখিত হইয়া আছে। কিন্তু, মোছলেম জাতীয়তার সেই জীবনবেদ, আজ বিস্মৃত, অনাদৃত, অজ্ঞাত অতীতে পরিণত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই আধারের দুর্দ্দশায় আধেয়ের এই পরিণতি,—জননীর অধঃপতনে সন্তানের, অর্থাৎ বর্ত্তমান মুছলমান সমাজের এই পরিণাম।

## মুছলমান আজ ভুলিয়া গিয়াছে যে—

দুনৃয়ার সর্ব্বপ্রথম মুছলমান, একজন নারী—বিবি খদিজা।

এছলামের সর্ব্বপ্রথম মোজ্‌তাহেদ, একজন নারী—বিবি আয়েশা।

এছলামের সর্ব্বপ্রথম শহিদ একজন নারী—আম্মার জননী বিবি ছমিয়া।

এছলামের সর্ব্বপ্রথম হাঁসপাতালের সর্ব্বপ্রথম পরিচালিকা, একজন নারী—বিবি রা'ফিজা আছলামিয়া।

এছলামের ইতিহাসে জল-যুদ্ধ যাত্রার সর্ব্বপ্রথম আগ্রহশালিনী ছিলেন,—একজন নারী—বিবি উম্মে হারাম। অবশেষে, হজরত ওছমানের খেলাফত কালে সাইপ্রাস অভিযানে বীর সৈনিকের বেশে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া ইনি শাহাদত প্রাপ্ত হন।

আর কত বলিব? কাহাকে বলিব? মোছলেম বঙ্গের এই জীবন গন্ধহীন শূন্য গোরস্থানে এ-আর্ত্তনাদের কোন সার্থক প্রতিধ্বনি জাগিয়া ওঠা কখনও সম্ভবপর হইবে কি?

# সঙ্গীত-সমস্যা

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, এছলাম ধর্ম্মে সকল প্রকারের সমস্ত সঙ্গীতকেই নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের আলেম সমাজ সাধারণভাবে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে যে সব কঠোর অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতেও জনসাধারণের উপরোক্ত বিশ্বাসের যথেষ্ট পোষকতা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু, এ-সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করার পর, আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, জনসাধারণের এই বিশ্বাস বা আলেম সমাজের এই অভিমত মূলতঃ এছলামের, অর্থাৎ কোরআন-হাদিছের দলিল প্রমাণের সহিত আদৌ সমঞ্জস নহে।

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, কোন কাজের সিদ্ধতা ও অসিদ্ধতা সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে, যাঁহারা সেই কাজকে অসিদ্ধ বলিয়া দাবী করিবেন—প্রমাণের ভার পড়িবে তাঁহাদের উপর। অর্থাৎ তাঁহাদিগকেই সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, আলোচ্য কার্য্যটী অমূক আইনের অমূক ধারামতে অপরাধজনক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। 'হোরমতের' বা অসিদ্ধতার প্রমাণ না থাকিলেই তাহা সিদ্ধ বা জাএজ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এ ক্ষেত্রে 'জওয়াজের' বা সিদ্ধতার প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য অপর পক্ষকে বাধ্য করা হইতে

পারে না। ফলতঃ সঙ্গীত হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার সন্তোষজনক প্রমাণ যদি বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, ইহাই তাহার সিদ্ধতা বা জাএজ হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ।

"অমুক কাজ এছলামে নিষিদ্ধ"—এরূপ দাবী যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, কোরআনের অমুক আয়তে বা হজরতের অমুক হাদিছে সেই কাজকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলিয়া স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। এছলামে সকল প্রকারের সঙ্গীত সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ—এই দাবী যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদিগকেও ঐ প্রকারের কোরআনের আয়ত বা হজরতের হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্টভাবে নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করিতে হইবে। আমরা দাবী করিয়া বলিতেছি—ত্রিশ পারা কোরআনের মধ্যে এরূপ একটী আয়তও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহাতে সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে, হজরত রছুলে করীম সঙ্গীত মাত্রকেই নিষিদ্ধ, বা না-জাএজ বলিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছেন—এরূপ একটীও ছহি হাদিছ আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। অধিকন্তু এই প্রকার কোন ছহি হাদিছ বিদ্যমান না থাকার কথা বহু সর্ব্বজনমান্য আলেম ও এমাম একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সঙ্গীত নিষিদ্ধ নহে—ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু, এই আলোচনাকে পূর্ণ পরিণত করার জন্য অধিকন্তু হিসাবে আমরা ইহাও দেখাইব যে, সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ নাই। শুধু ইহা নহে, বরং হজরতের কাজ ও কথা দ্বারা সঙ্গীতের সিদ্ধতা বা জাএজ হওয়ার Positive প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

পক্ষান্তরে, আমরা ইহাও সপ্রমাণ করিয়া দেখাইব যে, ছাহাবীগণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত আমাদের

এমাম, মোজাদ্দেদ, মোজতাহেদ এবং স্বনামধন্য আলেম ও গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ আমরা আজ যাহা বলিতে যাইতেছি—তাহা আমাদের আবিষ্কৃত নূতন কথা আদৌ নহে।

আমরা বিশ্বাস করি—এছলাম আল্লার সত্য ধর্ম্ম, পূর্ণ ধর্ম্ম ও শাশ্বত ধর্ম্ম। সকল দেশে, সকল যুগে তাহা সমানভাবে প্রযুজ্য। সুতরাং এছলাম অচল কখনই হইবে না—এছলামের সংস্কারের আবশ্যক কখনও হইবে না। নিজেদের উপেক্ষা, অজ্ঞতা ও অন্ধ বিশ্বাসের ফলে আল্লার সেই সত্য, সনাতন, পূর্ণ ও শাশ্বত ব্যবস্থাকে নানা আবর্জ্জনাপুঞ্জের মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া কার্য্যতঃ তাহাকে অচল করিয়া ফেলিয়াছি আমরাই। সেই আবর্জ্জনাপুঞ্জকে ধৈর্য্যের সহিত অপসারিত করিয়া ফেলাই সংস্কারকের কাজ—তাহা হইলেই তাহার এই বাহিরের অচলতা আপনা আপনিই দূর হইয়া যাইবে।

আলেম সমাজের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গীতকে একদম হারাম বলিয়া কঠোরতার সহিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহাদের এই নিষেধ-ধারার মূলে মুছলমান সমাজের—বিশেষতঃ তাঁহাদের খলিফা ও আমীরগণের নৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটা গুরুতর প্রভাব বিদ্যমান আছে। একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সমসাময়িক যুগের ব্যভিচার ও সীমা-লঙ্ঘনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবস্থা গতিকে বৃহত্তর অমঙ্গলের গতিরোধ করার সাধু উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ঐ প্রকার ব্যবস্থা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই কঠোরতা অবলম্বনের আর একটা কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—অন্য দিকের চরমপন্থী, তথাকথিত ছুফী ও ফকিরগণ। তাঁহাদের অনাচারের

ফলে সঙ্গীতকে সকলে ধর্ম্ম এবং সাধনার প্রধানতম অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে, সঙ্গীতের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রেম সাধনার নামে অসংযত জনসমাজে নানা কুৎসিত ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ফলে, এই নিষেধের ব্যবস্থার সহিত উপরোক্ত দুইটা অবস্থার প্রভাব খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়ীভূত হইয়া আছে। সে যাহা হউক, এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা এই শ্রেণীর আলেমগণের এজ্‌তেহাদ এবং তাহার সঙ্গতি-অসঙ্গতি সর্ব্বদাই প্রমাণ সাপেক্ষ। এই এজ্‌তেহাদ সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হইলে এবং বর্ত্তমান যুগের জন্য, ব্যাপকতর ও বৃহত্তর অমঙ্গলের গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আবশ্যক হইলে. ধর্ম্মের হিসাবে ও যুক্তির হিসাবে এখনও ঐ ব্যবস্থা সমানভাবে প্রযুজ্য হইতে পারে।

সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া সপ্রমাণ করার চেষ্টা যে সকল আলেম করিয়াছেন, তাঁহাদের দলিল প্রমাণগুলি অবগত হওয়ার নিমিত্ত আমরা তাঁহাদের বহি পুস্তকের সন্ধান লইতে কোন প্রকার ক্রটী করি নাই। আমাদের মতে হাফেজ এমাম এবনে যওজীকে এক্ষেত্রে অন্যপক্ষের প্রধান উকীলের পদ দেওয়া যাইতে পারে। এমাম ছাহেব নিজের "তালবিছ-এব্‌লিছ" পুস্তকে ২৩৭ হইতে ২৬৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সঙ্গীত হারাম হওয়ার অনুকূল ও প্রতিকূল প্রমাণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সঙ্গীত হারাম হওয়ার অনুকূলে কোরআনের তিনটি আয়ত এবং হজরতের কয়েকটী হাদিছ প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বপ্রথমে প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত ঐ সকল দলিল প্রমাণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। নিজদের অন্যান্য বক্তব্যগুলি তাহার পর যথাক্রমে নিবেদন করার চেষ্টা পাইব।

## প্রথম প্রমাণ

ছুরা 'লোকমানের' প্রথম রূকুতে বর্ণিত হইয়াছে :—

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم - و يتخذها هزوا ' اولئك لهم عذاب مهين - و قرا' فبشره بعذاب اليم -

অর্থাৎ—"এবং কোন কোন লোক এরূপ আছে **যাহারা (লোকদিগকে) আল্লার পথ হইতে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে** বিনাজ্ঞানে কথার মধ্যকার যাহা বেহুদা তাহাকে ক্রয় করিয়া থাকে এবং আল্লার পথকে হাসি তামাশারূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, অপমানজনক আজাব ইহাদিগের জন্যই (নির্দ্ধারিত) আছে। এবং আমার আয়তগুলি যখন তাহাদিগের নিকট অধীত হয়, তখন তাহারা অহঙ্কার ভরে ফিরিয়া দাঁড়ায়, যেন তাহারা তাহা শ্রবণ করে নাই, তাহাদের কর্ণদ্বয় যেন বধির। অতএব, তাহাদিগকে ক্লেশদায়ক দণ্ডের সংবাদ শুনাইয়া দাও!"

এমাম এবনে যওজী ও তাঁহার স্বপক্ষীয়রা বলিতেছেন—এই আয়তে বর্ণিত لهو الحديث বা বেহুদা কথা অর্থে সঙ্গীত। কারণ, এবনে মছউদ ও এবনে আব্বাছ নামক দুইজন ছাহাবী ঐ পদের ঐরূপ তাৎপর্য্য করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহারা কএকটা হাদিছ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—গায়িকা-দাসীদিগের ক্রয়-বিক্রয় যে এই আয়ত কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্বয়ং হজরত রছুলের প্রমুখাৎ খুব স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

এই আয়তের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে পাঠকগণকে সম্পূর্ণ আয়তটীর প্রতি মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাহা হইলেই দেখা যাইবে যে, 'লাহওল-হাদিছকে' সঙ্গীত অর্থে গ্রহণ করিলেও, উহা দ্বারা সকল সঙ্গীত সকল অবস্থায় কখনই নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয় না। তফছিরকারেরা এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

اللام للتعليل ...... فافاد هذا التعليل انــه انما يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقصد -

অর্থাৎ—"ليضل শব্দের নাম 'তা'লিল' বা কারণ ব্যঞ্জক। অতএব, উহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মানুষকে আল্লার পথ হইতে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে যেসব বেহুদা কথা গ্রহণ করা হয়, আয়তে কেবল তাহারই নিন্দা করা হইয়াছে।" এরূপ অবস্থায় গদ্য পদ্য, সঙ্গীত অসঙ্গীতের কোনই পার্থক্য থাকে না—অর্থাৎ তাহা নিষিদ্ধ হয় গদ্য বলিয়া বা সঙ্গীত বলিয়া নহে, আল্লার পথ হইতে মানুষকে ভ্রষ্ট করার জন্য তাহাকে উপলক্ষরূপে ব্যবহার করা হয় বলিয়া।

আয়ত দুইটী সরাসরিভাবে পড়িয়া দেখিলেও জানা যাইবে যে, যে সকল ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তি জনসাধারণকে এছলাম হইতে পরাঙ্মুখ করার জন্য নানাবিধ বেহুদা বাক্যবিন্যাস করিতে অভ্যস্ত ছিল এবং যাহারা কোরআনের আয়তগুলিকে শ্রবণ করিয়া অহঙ্কারভাবে তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, আয়তে তাহাদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে মাত্র। সঙ্গীত ও অসঙ্গীত লইয়া কোন কথাই এখানে বলা হয় নাই।

পাঠকগণ দেখিতেছেন—মতভেদের মূল হইতেছে, لهو শব্দের তাৎপর্য্য লইয়া। অন্য পক্ষ বলিতেছেন যে, উহার অর্থ সঙ্গীত এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা এবনে আব্বাছ ও এবনে মছউদের

উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম নিবেদন এই যে, আমরা আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাছ ও এবনে মছউদকে, বোজর্গ বলিয়া মান্য করিলেও, নবী ও মাছুম বলিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে কখনও প্রস্তুত নহি। সুতরাং তাঁহাদিগের উক্তিমাত্রকে বিনা বিচারে গ্রহণ করা আমরা অসঙ্গত বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। কোরআনের তফছির সম্বন্ধে ইঁহাদিগের শত শত কথা আলেম মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্যথায় কএকটা ছুরাকে কোরআনের অঙ্গ হইতে বাদ দিয়া ফেলিতে হইবে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, তফছিরের কেতাবগুলিতে স্বয়ং হজরতের নামকরণে এরূপ শত শত রেওয়ায়ত সন্নিবেশিত হইয়া আছে, বস্তুতঃ যাহা হজরতের হাদিছ কখনই নহে। এ অবস্থায় ছাহাবাগণের নাম করিয়া যে সকল রেওয়ায়ত তফছির গ্রন্থসমূহে স্থানলাভ করিয়া আছে, তাহার সঙ্কলনে গ্রন্থকারগণ যে কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হজরত এবনে আব্বাছের তফছির বলিয়া যে পুস্তকখানা আমাদের সমাজে চলিয়া যাইতেছে, তাহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া দেখিলেই আমরা অনেক রহস্য অবগত হইতে পারিব। ইহার একটা প্রমাণ এই যে, এবনে আব্বাছ এরূপ কথা বলেন্ নাই—স্বয়ং সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ( দেখ—আগানী ১—৩২ )।

'লাহ্ও' শব্দের অর্থ—সকল প্রকারের খেলা, তামাশা, অনর্থক কাজ, কথা বা আনন্দদায়ক ব্যাপার—যাহা মনুষকে গুরুতর বিষয় হইতে বিরত করিয়া রাখে। ( রাগেব, মাওয়ারেদ প্রভৃতি )।

'হাদিছ' শব্দের অর্থ কথা। 'লাহওল-হাদিছ' পদের অর্থে اللهو من الحديث ( ম্যজমাউল বেহার )। অতএব, ঐ শ্রেণীর সমস্ত

কথাই উহার অন্তর্ভুক্ত, তা সে সঙ্গীতই হউক, বা না হউক। অর্থাৎ যে অবস্থায় যে শ্রেণীর কথা বলা বা শোনা নিষিদ্ধ, যে অবস্থায় যে শ্রেণীর গদ্য পড়া বা শোনা নিষিদ্ধ, যে অবস্থায় যে শ্রেণীর পদ্য পড়া বা শোনা নিষিদ্ধ—সে অবস্থায় সেই শ্রেণীর গান করা ও শোনাও নিষিদ্ধ হইবে। আর যে অবস্থায় যে শ্রেণীর কথাবার্ত্তা সিদ্ধ, সে অবস্থায় সেই শ্রেণীর সঙ্গীতও সিদ্ধ। বস্তুতঃ হজরত এবনে আব্বাছের নামকরণে বর্ণিত সমস্ত রেওয়ায়ত একত্র করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। এবনে আব্বাছ স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন— هو الغناء و اشباهه অর্থাৎ—"গান ও তাহার অনুরূপ বিষয়সমূহ হইতেছে "লাহ্ও।" সুতরাং একমাত্র সঙ্গীতকেই 'লাহ্ও' বলা হইতেছে না—তাহার অনুরূপ সমস্ত বিষয়ই ইহার অন্তর্ভূক্ত। সঙ্গীতকে সঙ্গীত বলিয়া হারাম করিলে তাহার জন্য এমন একটা ব্যাপক শব্দ কখনই ব্যবহার করা হইত না। ফলে 'লহ্ওল-হাদিছের' অন্তর্ভূক্ত হইবে যে সকল সঙ্গীত এবং যুগপৎ-ভাবে মুছলমানদিগকে এছলাম হইতে বিচলিত করার উদ্দেশ্য যে সঙ্গীতকে উপলক্ষরূপে গ্রহণ করা হইবে, এই আয়ত হইতে গৌণভাবে কেবল সেই শ্রেণীর সঙ্গীতের নিষিদ্ধতা সপ্রমাণ হইতেছে,—যেমন সকল প্রকারের কথাবার্ত্তা এবং ওয়াজ বক্তৃতাও এই পর্য্যায়ভুক্ত হইলে আলোচ্য আয়ত দ্বারা তাহাও নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে। এই প্রকারের কোন কোন কথাবার্ত্তা, বা কোন কোন ওয়াজ বক্তৃতা এই আয়ত হইতে ঐরূপ ব্যাপক অর্থে গৌণভাবে হারাম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে—এই যুক্তির বলে দুনয়ার সমস্ত নির্দ্দোষ কথাবার্ত্তা বা সঙ্গত ওয়াজ বক্তৃতাকে হারাম বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া কখনই উচিত হইবে না।

এমাম এবনে যওজী এই আয়তকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত করিয়া

নিজেদের মতের পোষকতার জন্য কএকটা হাদিছের উল্লেখ করিয়াছেন। এই হাদিছগুলির সারমর্ম্ম এই যে, হজরত রছুলে করীম বলিতেছেন—গায়িকা-দাসীর ক্রয়-বিক্রয় এবং তাহাদিগকে (সঙ্গীত) শিক্ষা দেওয়া হারাম। এই আদেশ প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলোচ্য আয়তের বরাত দিয়াছেন। অতএব, এই আয়ত যে গায়িকা-দাসীদিগের ক্রয়-বিক্রয় হারাম করিয়া দিতেছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না। তাহার পর, ইহাও দেখা যাইতেছে যে, গায়িকা-দাসীর ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়ার হেতু হইতেছে তাহার সঙ্গীত, অন্যথায় সাধারণ দাস-দাসীর বিক্রয় তখন অসিদ্ধ ছিল না।

এ-সম্বন্ধে প্রথম ও শেষ কথা এই যে, বস্তুতঃ ঐ রেওয়ায়তগুলি এতদূর দুর্ব্বল ও অবিশ্বস্ত যে, তাহাকে হজরতের হাদিছ বলিয়া বর্ণনা করা কখনই সঙ্গত হইবে না। এমাম তিরমিজী এই হাদিছের উল্লেখ করিয়া উহাকে "গরিব হাদিছ" এবং উহার রাবী আলী এবনে জয়েদকে 'দুর্ব্বল' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম হাফেজ এবনে কছির বলিতেছেন—قلت على وشيخه والراوى عنه كلهم ضعفاء অর্থাৎ—"এই হাদিছের রাবী আলী, তাহার গুরু এবং তাহার শিষ্য সকলেই 'দুর্ব্বল'।" (তফছির এবনে কছির ৮—৩)। 'এ সম্বন্ধে একটী হাদিছও নির্দ্দোষ নহে' (ফৎহুল বায়ান ৭—২০৯) এই সকল হাদিছের রাবীদিগের দুর্ব্বলতা ও অবিশ্বস্ততার কথা বিভিন্ন চরিত-অভিধানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে, বিজ্ঞ পাঠকগণকে সেগুলির বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

ফলে এই আলোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে—

(ক) কোরআনের এই আয়ত হইতে সঙ্গীত মাত্রের নিষিদ্ধ হওয়া কখনই সপ্রমাণ হইতে পারে না।

(খ) ইহার পোষকতার জন্য যে সকল রেওয়ায়ত বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত 'দুর্ব্বল' ও অবিশ্বাস্য। ঐগুলিকে হজরতের উক্তি বলিয়া দাবী করা কোন মতেই সঙ্গত হইবে না।

## ২য় প্রমাণ

ছুরা 'নজমের' শেষ রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে—

افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون و لا تبكون
و انتم سامدون -

অর্থাৎ—"তবে কি তোমরা এই (কেয়ামতের) কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতেছ? এবং হাসিতেছ—কাঁদিতেছ না। আর তোমরা হইয়া আছ গাফেল!"

আয়তে আছে 'ছামেদুন', উহার এক বচন ছামেদ, অর্থ গাফেল। (কবির ৭—৭৭৯)। এবনে যওজী ও তাঁহার সম-মতাবলম্বীরা বলিতেছেন—ছামেদ শব্দের অর্থ সঙ্গীতকারী। কারণ এবনে আব্বাছ বলিয়াছেন, উহা আরবী ভাষার শব্দ নহে—হেময়রী ভাষায় উহার অর্থ সঙ্গীত।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, হজরত এবনে আব্বাছ ঐরূপ কথা বলেন নাই, বলিলেও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। নাফে-এবনুল আজরকের প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং এবনে আব্বাছ হোজায়লার কবিতা উদ্ধৃত করিয়া উহার আরবী ভাষার শব্দ হওয়া দৃঢ়তার সহিত সপ্রমাণ করিতেছেন (দুররে মনছুর ৭—১৩৭)। এ অবস্থায় তিনি কি করিয়া বলিতে পারেন যে, উহা বিদেশী ভাষার শব্দ! তাহার পর কোরআনে বিদেশী ভাষার কোন শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া

অধিকাংশ এমাম ও আলেমগণ স্বীকার করেন না। (এৎকান দেখ) পক্ষান্তরে, আরবী ভাষায় উহার বহুল প্রচলন আছে। "একদা হজরত আলী মছজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—মুছল্লীরা তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে হজরত আলী তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ما لى اراكم سامدين অর্থাৎ—"আমি তোমাদিগকে 'ছামেদীন' প্রাপ্ত হইতেছি, ইহার কারণ কি?" (কন্‌জুল-ওম্মাল ৪—২৫০)। অর্থাৎ বসিয়া জেকের, ফেকের ও ধ্যান ধারণায় মশগুল থাকিবে—তাহার প্রতি 'গফলত' করিয়া তোমরা দাঁড়াইয়া আছ, ইহার কারণ কি? অন্য পক্ষের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে এখানে এই হাদিছের অর্থ এইরূপ দাঁড়াইবে:—"মুছল্লীরা হজরত আলীর অপেক্ষায় মছজিদে দাঁড়াইয়াছিলেন—এমন সময় তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—তোমাদের সকলকে গান গাহিতে দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'ছমদ' শব্দের অর্থ যে সঙ্গীত, হজরত এবনে আব্বাছ এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণ করা যায় না। এই রেওয়ায়তটি নির্ভর করিতেছে একরামার বর্ণনার উপর। এই একরামার মত অবিশ্বস্ত রাবী খুব কমই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এবনে আব্বাছের নামে বহু মিথ্যা হাদিছ বর্ণনা করার ফলে স্বয়ং তাঁহার পুত্র আলী অবশেষে একরামাকে থামের গায়ে বাঁধিয়া রাখেন। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করা হইলে আলী বলেন—ان هذا الخبيث يكذب على ابى অর্থাৎ—"এই খবিছটা আমার পিতার নামে মিথ্যা রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়া থাকে।" একরামা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার জন্য মীজানুল—এ'তেদাল' ২—১৮৭—৮৯ পৃষ্ঠা ও চরিত-অভিধান সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তক দ্রষ্টব্য।

এহেন একরামা এবনে আব্বাছের নাম করিয়া যে রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাহা তাঁহার অন্যান্য রেওয়ায়তের বিপরীত, তাহা কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না। এমাম এবনে যওজীর ন্যায় একজন মোহাদ্দেছ হালাল-হারামের বিচার প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর রেওয়ায়ত-গুলিকে যে কেমন করিয়া প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতে পারিয়াছেন, বস্তুতঃ আমরা তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।

## ৩য় প্রমাণ

কোরআনের 'বনি-এছরাইল' ছুরায় এবলিছের কথার উত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—واستفزز من استطعت منهم بصوتك অর্থাৎ—"এবং তাহাদিগের মধ্যকার যাহাকে পার—নিজের শব্দের দ্বারা বিচলিত করার চেষ্টা করিতে থাক।" এমাম এবনে যওজী ও তাঁহার সম-মতাবলম্বীরা বলিতেছেন—শয়তানের শব্দই হইতেছে সঙ্গীত, কারণ—মোজাহেদ ঐরূপ বলিয়াছেন! এখানে কিন্তু তাঁহারা এবনে আব্বাছের তফছিরকে উপেক্ষা করিতে একবিন্দুও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

মোজাহেদ বলিয়াছেন—'ছওৎ' শব্দের অর্থ সঙ্গীত, আর আরবী সাহিত্যের চিরাচরিত সিদ্ধান্তের, এমন কি কোরআনের ব্যবহারের বিপরীত তাহা সঙ্গীত হইয়া গেল, আর সেই ব্যক্তিগত অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া একটা হালালকে হারাম বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া হইল,—ইহা অপেক্ষা অন্যায় ও অসম সাহসিকতার কথা আর কি হইতে পারে? ছুরা 'হোজরাতে' মোমেনদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে:--لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى অর্থাৎ—"তোমরা নিজেদের 'ছওৎকে' নবীর ছওতের উপর উচ্চ করিও

না'।" এখানে 'ছওৎ' শব্দের অর্থ আওয়াজ, স্বর; সঙ্গীত ইহার অর্থ কখন হইতে পারে না। ছুরা 'লোকমানে' واغضض من صوتك বলা হইয়াছে! এখানে 'ছওৎ' অর্থে সঙ্গীত কি কখনও হইতে পারে? ইহার পরেই বলা হইয়াছে:—ان انكر الاصوات لصوت الحمير

'ছওৎ' শব্দের অর্থ সঙ্গীত হইলে এখানে আয়তের অনুবাদ হইবে—"নিশ্চয় সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত সঙ্গীত হইতেছে গর্দ্দভের গান।" অন্য পক্ষ বলিয়া থাকেন—'ছওৎ' শব্দের অর্থ যে স্বর, শব্দ আওয়াজ, তাহা আমরাও মানি। কিন্তু, এখানে শয়তানের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া ভাবার্থে উহার তাৎপর্য্য হইবে সঙ্গীত। কারণ শয়তান সঙ্গীত দ্বারাই মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে! কিন্তু এই সব তাৎপর্য্য গ্রহণের এবং শয়তান সংক্রান্ত এই অনুমানের কোনও প্রমাণ তাঁহাদিগের নিকট নাই। সূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক লইয়া যেখানে আলোচনা, সেখানে এই শ্রেণীর বাজে কথার অবতারণা হইতে দেখিলে দুঃখ হয়।

সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ অন্য পক্ষ হইতে যে তিনটী আয়ত উপস্থাপিত করা হইয়াছে, উপরে তাহার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, সঙ্গীত সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হওয়ার সহিত ঐ আয়তগুলির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। প্রথম আয়তের তাৎপর্য্যের পোষকতার জন্য তাঁহারা যে হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একেবারে অবিশ্বাস্য ও অকর্ম্মণ্য রেওয়ায়ত-সেগুলিকে হজরতের হাদিছ বলিয়া দাবী করা নিতান্ত অন্যায়। অন্য পক্ষ এই প্রকারের আরও কতিপয় রেওয়ায়তকে হজরতের হাদিছ আখ্যা দিয়া জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়া থাকেন, আমরা সে সমস্ত হাদিছের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করার চেষ্টা পাইব।

এখানে আবার বলিয়া রাখিতেছি—সঙ্গীত সম্বন্ধে আমরা যে কথা

বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, বস্তুতঃ তাহা আদৌ আমাদের কথা নহে—ইহা বর্ত্তমান যুগের কোন অভিনব আবিষ্কারও নহে। আমরা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইব যে—

(১) হজরত রছুলে করীম স্বয়ং সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন ও তাহার অনুমতি এমন কি আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

(২) হজরতের বহু ছাহাবী সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন।

(৩) এমাম আবু হানিফা, এমাম মালেক, এমাম শাফেয়ী, এমাম আহমদ-বেন-হাম্বল প্রভৃতি এমামগণ সঙ্গীতকে জায়েজ বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজেরাও সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। এমাম মালেক ত নিজেই একজন সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন।

(৪) এমাম এবনে হাজম, কাজী ঈছা, এবনুল আরবী, এমাম মাওর্দ্দী, আবু তালেব মক্কী, এমাম গজ্জালী প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া এমাম শওকানী, শাহ আবদুল আজিজ, মোল্লা আলী কারী, কাজী ছানাউল্লা পানিপতী, মওলানা আবদুল হক মোহাক্কেক দেহলবী, প্রভৃতি শত শত এমাম ও মোহাদ্দেছ একবাক্যে সদ্ভাব পূর্ণ বা নির্দ্দোষ আনন্দদায়ক সঙ্গীতকে সিদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এছলাম ধর্ম্মে সঙ্গীতকে সঙ্গীত বলিয়া হারাম করা হইয়াছে—হজরত রছুলে করীমের সেরূপ কোন আদেশ আমরা এ-পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। সঙ্গীত সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষ হজরতের নামকরণে যে সকল তথাকথিত হাদিছের উল্লেখ করিয়া থাকেন, অভিজ্ঞ মোহাদ্দেছগণের মতে তাহার একটীও বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ঐ হাদিছগুলির অপ্রামাণিকতা সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনা পাঠকগণের নিকট প্রীতিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সেইজন্য বর্ত্তমানে আমরা কতকগুলি "উক্তি" উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি।

বাঙ্গলার আলেম সমাজের খেদমতে আমাদের বিনীত আরজ—এই ধারণা সঙ্গত না হইলে, তাঁহারা আমাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিন। ইহাতে আমরা যৎপরোনাস্তি বাধিত ও উপকৃত হইব। অবশ্য পূর্ব্ব সতর্কতার হিসাবে এখানে এটুকু আরজ করিয়া রাখাও সঙ্গত মনে করিতেছি যে, নিজেদের সামান্য শক্তি অনুসারে আমরাও এ-সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য চেষ্টার ক্রটী করি নাই। তাঁহারা যে হাদিছ-গুলিকে সঙ্গীত নাজাএজ হওয়ার প্রমাণ করিয়া পেশ করিবেন—সেগুলি বস্তুতঃ নির্দ্দোষ ও প্রামাণ্য কিনা এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাতে সদসৎ নির্ব্বিশেষে সকল সঙ্গীতকে হারাম বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে কিনা—প্রকাশ্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে এ-কথাগুলি যেন তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন।

সঙ্গীত হারাম হওয়া সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিছ বিদ্যমান নাই—এ-সম্বন্ধে কএকজন স্বনামখ্যাত মোহাদ্দেছের উক্তি নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

(১) এমাম নবভী ছহি 'মোছলেমের' টীকায় বলিতেছেন—

ذهب الامام ابن حزم الى اباحة الغناء و الملاهى ؛ قال : لم يصح فى تحريمها حديث -

অর্থাৎ—"গীত-বাদ্যকে এমাম এবনেহাজম 'মোবাহ' বা নির্দ্দোষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—'গীত-বাদ্য' হারাম হওয়ার অনুকূলে একটীও ছহি হাদিছ বিদ্যমান নাই" ( নবভী ১—১২ )।

(২) 'কামুছ' নামক বিখ্যাত অভিধান রচয়িতা, সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ আল্লামা মজউদ্দিন ফিরোজাবাদী "ছেফরুছ-ছাআদত" পুস্তকে বলিতেছেন :—در باب ذم سماع حديثے صحيح وارد نشده

অর্থাৎ—"সঙ্গীতের নিন্দাবাদ সম্বন্ধে একটীও ছহি হাদিছ তয়ারেদ হয় নাই।"—শার্হে 'ছেফরুছ-ছাআদত' ৫৬১ পৃষ্ঠা।

(৩) মওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী এই উক্তি উপলক্ষে একটু বিচলিতভাবে আলোচনা করিয়া অবশেষে ন্যায়ের খাতিরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে :—و بالجمله آنچه دریںجا منقح

می گردد که بر حرمت سماع علی الاطلاق دلیلے قطعی از ضروریات

دین ثابت نشود -

অর্থাৎ—"মোটের উপর এখানে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাধারণভাবে সমস্ত সঙ্গীত হারাম হওয়ার কোন চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।" (ঐ—৫৬৫)।

(৪) মোছলেম-ভারতের নব জাগরণের সর্ব্বপ্রধান প্রতীক এবং সর্ব্বপ্রথম সমাজ-সংস্কারক মওলানা শাহ এছমাইল শহীদ বলিতেছেন :—

باید دانست که استماع غنا ... ... از ممنوعات شرعیه نیست -

অর্থাৎ—"জানা আবশ্যক যে, গান শ্রবণ করা শরিয়তের দলিল প্রমাণ অনুসারে নিষিদ্ধ নহে।" (সংক্ষেপে উদ্ধৃত,—'ছেরাতে মোস্তাকিম' (১০৭—১১০)।

এ-সম্বন্ধে আরও অনেক "উক্তি" উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু আপাততঃ এইখানে ক্ষান্ত হইতেছি। পূর্ব্বের দাবী অনুসারে এখন আমরা দেখাইব যে—

(১) হজরত রছুলে করিম স্বয়ং সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুমতি—এমন কি, স্থান বিশেষে আদেশ পর্য্যন্ত—প্রদাণ করিয়াছেন।

(২) খায়রুল-কোরুনের স্বর্ণযুগে হজরতের ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতেন।

(৩) বিশ্বস্ত এমাম ও আলেমগণের মধ্যে অনেকেই নিজেরা সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন ও তাহাকে জাএজ বলিয়া মনে করিতেন। বহু মান্যগণ্য এমাম ও মোহাদ্দেছ, সঙ্গীত সিদ্ধ হওয়া বা সাধারণভাবে তাহা অসিদ্ধ না হওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন—এমন কি, কেবল এই বিষয় তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবেও বহি-পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

## প্রথম দাবীর প্রমাণ

(ক) খালেদ নামক একজন তাবেয়ী বলিতেছেন—"আশুরার দিন আমরা মদিনায় ছিলাম, সেখানে جوارى স্ত্রীলোকেরা বাজাইতেছিল, আর গান গাহিতেছিল।...আমরা এ-সম্বন্ধে মোআউজের কন্যা রবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তিনি বলিলেন—আর বাসর কালে হজরত আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তুমি যেমন ভাবে বসিয়া আছ—অমনি করিয়া আমার বিছানার উপর উপবেশন করিলেন। আমাদের দাসীরা তখন দফ বাজাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল--" (বোখারী, আবু দাউদ, এবনে মাজা প্রভৃতি)।

(খ) মোছলেমকুল-জননী বিবি আয়েশা বলিতেছেন (বিভিন্ন রেওয়াতের সার):—"আনছার গোত্রের একটী বালিকা আমার প্রতিপালনাধীনে ছিল। তাহার বিবাহের পর হজরত শুভাগমন করিয়া বলিলেন—আয়েশা! এ কি রকম! গানের ব্যবস্থা কর নাই কেন? নব বধুর সঙ্গে একজন গায়িকা তাহার শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দাও—আনছার বংশ খুবই সঙ্গীতপ্রিয়।" (বোখারী, এবনে মাজা, এবনে হব্বান)।

(গ) বিবি আয়েশা বলিতেছেন—"একদা ঈদের সময় হজরত সর্বাঙ্গ কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন—আর দুইজন 'জারিয়া' সেখানে বসিয়া দফ বাজাইয়া বাজাইয়া বোআছের সঙ্গীত গান করিতেছে, এমন

সময় আমার পিতা উপস্থিত হইয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—একি! হজরতের সমক্ষে শয়তানের ঝঙ্কার! * হজরত তখন মুখের কাপড় ফেলিয়া বলিলেন—আবু বকর, ক্ষান্ত হও! সকল জাতির একটা উৎসব আছে, ইহাদেরও আজ উৎসবের দিন"। ( বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি )।

( ঘ ) হজরত রছুলে করীম কোন এক অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিলে জনৈক স্ত্রীলোক তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন—হজরৎ! আমি নজর মানিয়াছি. আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিলে আমি আপনার সম্মুখে দফ বাজাইব, আর গান গাহিব।" হজরত বলিলেন—বেশ কথা, নিজের নজর পূরা কর। তখন সেই স্ত্রীলোকটি গান করিতে লাগিলেন—।" ( আবু দাউদ ও তিরমিজি )।

পাঠকগণ! এখানে স্মরণ রাখিবেন যে, হারাম কাজে নজর মানিলে তাহা পূর্ণ করা শরিয়তে জাএজ বলিয়া পরিগণিত হয় না। সুতরাং গান-বাজনা একদম হারাম হইলে হজরত বলিয়া দিতেন, তোমার নজরই valid নহে, সুতরাং তাহা আর তোমাকে পূরা করিতে হইবে না। لا وفاء لنذر في معصية — —কোনও পাপ কার্য্যের নজর পূরা করা অসঙ্গত"—ইহা হজরতের স্পষ্ট হাদিছ ( বোখারী, মোছলেম )। নির্দ্দোষ গান-বাজনাকে হজরত যে গোনাহ বলিয়া আদৌ মনে করিতেন না, এ-হাদিছটা তাহার অকাট্য প্রমাণ।

---

* আবু বকর মনে করিয়াছিলেন, হজরত নিদ্রিত, অধিকন্তু হজরতের হুজুরে গান করাকে তিনি বে-আদবীর কথা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। হজরত বলিলেন—উৎসবের দিন সকলকে প্রাণ খুলিয়া আনন্দ করিতে দাও। উৎসবের দিন কনিষ্ঠদের এই যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ, ইহাতে বে-আদবী হয় না।

(ঙ) আনছ বলিতেছেন—হজরতের একজন হুদী-গায়ক ছিলেন, তাঁর নাম আন্‌জাশা। (বোখারী, মোছলেম)।

অভিধানকারেরা বলিতেছেন—

حدا زادن شتر بسرود و آواز

স্বর ও সঙ্গীতের দ্বারা উট চালনা করাকে হুদি বলা হয় (ছোরাহ)।

মওলানা শাহ আব্দুল হক বলিতেছেন :—

و الحداء و الغناء مباح لا خلاف فيه لاحد

সঙ্গীতের মধ্যে হুদী গান মোবাহ্—ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। দেখ—লম্‌আত, মেশকাতের ৪১০ পৃষ্ঠার ১০ নং টীকায় উদ্ধৃত।

(চ) কাছওয়া এই মহামানবকে বহন করিয়া যখন নগরে প্রবেশ করিল, তখন মদিনার পুরমহিলাগণ উন্মুক্ত ছাদের উপর অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গান করিতেছিলেন। নাজ্জার গোত্রের বালিকারা দফ বাজাইয়া বাজাইয়া, তাহাদের সেই বীণা বিনিন্দিত শিশুকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কারে গান গহিয়া গাহিয়া হজরতের খেদমতে স্বাগত সম্ভাষণ নিবেদন করিতেছিল। (মোস্তফা-চরিত ৪৬৫)।

হজরত রছুলে করীম যে নিজে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, অন্যকে তাহা গান ও শ্রবণ করার অনুমতি—এমন কি, আদেশ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন, এই হাদিছগুলি হইতে তাহা স্পষ্ট ও অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। আমরা এখনে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি—সকল অবস্থায় সব সঙ্গীতকে সঙ্গীত বলিয়া হারাম হওয়ার ফৎওয়া যাঁহারা দিয়াছেন, পরহেজগারীর অতি-আগ্রহের ফলে তাঁহারা শরিয়তের স্পষ্ট বিধানকে অতি নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন—অমান্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, সঙ্গীত-সমস্যাকে বর্ত্তমান যুগের তরুণ সমাজের সম্মুখে

উপস্থাপিত করিয়া যাঁহারা এযাবৎ এছলামের ব্যবহারিক দিকের অচলতা সপ্রমাণ করার প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, আল্লার এছলাম আজ পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছে, তাঁহাদের মত সংস্কারের কৃপাদৃষ্টির আশায়—এছলামকে তাঁহারাও একটুও চিনেন নাই, চিনিবার চেষ্টাও করেন নাই।

প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—এসব হাদিছ হইতেছে নির্দ্দোষ ও সদ্ভাবপূর্ণ সঙ্গীত সম্বন্ধে। যে সব গান মানুষকে পাপ, কুরুচি, অশ্লীলতা এবং কুৎসিত কাজ বা ভাবের প্রতি আকর্ষণ করে, সে সঙ্গীত এ-পর্য্যায়-ভুক্ত নহে, তাহা নিশ্চয় হারাম। আমরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, বস্তুতঃ শেষোক্ত শ্রেণীর সঙ্গীত নিশ্চয়ই হারাম। কিন্তু, কথা শুধু এইটুকু যে, যাহা হারাম হইতেছে সঙ্গীত বলিয়া নহে—বরং পাপ বলিয়া অসদ্ভাব ও কুপ্রবৃত্তির সহায়ক ও উত্তেজক বলিয়া। যেমন, এই শ্রেণীর পাপ ও মন্দভাবপূর্ণ এবং কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক অ-সঙ্গীতও নিঃসন্দেহ রূপে হারাম। এখানে মওলানা শাহ আবদুল হক ছাহেবের একটী উক্তি উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না :—

جاهل کیست ؟ آنکه مطلق سماع بهر حال در هر وقت از هر کس اندک و بیش حرام داند' و فاسق آنکه مطلق آنرا حلال داند -
( نکات الحق - منقول از تحفۂ فقیر ص ۳۲ )

অজ্ঞ জাহেল সে—যে সকল অবস্থায় সকল প্রকারের সঙ্গীতকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করে, আর ব্যভিচারী ফাছেক সে—যে সকল প্রকারের সঙ্গীতকে সকল অবস্থায় জায়েজ বলিয়া মনে করে।

## দ্বিতীয় দাবীর প্রমাণ

(ক) আমের-এবনে-ছাআদ বলিতেছেন—আমি এক বি

যোগদান করিয়া কারাজা এবনে-কা'ব ও আবু মাছউদ নামক দুইজন আন্‌ছারী-ছাহাবীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, জারিয়াগণ সেখানে গান গাহিতেছে। ( নাছাই, মেশকাৎ, নেকাহ্‌ )।

(খ) قال النواوی : اجازت لصحابة غناء العرب الذی فیه انشاد و ترنم و الحداء و فعلوه بحضرته صلعم -

আরবের সঙ্গীতকে—যাহাতে ছন্দ ও সুর থাকিত—ছাহাবাগণ জাএজ জানিতেন এবং হজরতের হুজুরেও তাঁহার ঐরূপ সঙ্গীত গান করিয়াছেন। ( মোল্লা আলি কারী—আইনুল এল্‌ম্ )।

(গ) ছাহাবাগণ সাধারণভাবে সকল প্রকার সঙ্গীত শ্রবণ করা জাএজ জানিতেন—আবুতালেব মক্কী "কূতোল-কলুব" পুস্তকে ইহার বহু নজির বর্ণনা করিয়াছেন।

(ঘ) এমাম আবুল্‌ফর্জ এস্পেহানীর জগদ্বিখ্যাত আগানী পুস্তকে এবং এমাম আহমদ-এবনে-আব্দে রাব্বেহী العقد الفرید পুস্তকে ( ৩য় খণ্ড, ১৫৯—১৮৮ পৃষ্ঠা ) বহু ছাহাবী ও তাবেয়ী নর-নারীর সঙ্গীত শ্রবণ, সঙ্গীত চর্চ্চা ও সঙ্গীতে উৎসাহ দানের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত পুস্তকে সমস্ত বর্ণনা নিয়মিত 'ছনদ' সহকারে বর্ণিত হইয়াছেন এবং হাফেজ এবনে-হাজর ( বোখারীর বিখ্যাত টীকাকার ) উহাকে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন—এই কারণে নিম্নে 'আগানী' হইতে কএকটা বিবরণ অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) আব্দুল্লাহ-এবনে-জাফর সঙ্গীতে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। বিখ্যাত গায়ক طویس এবং গায়িকা عزة المیلاءর সঙ্গীত তিনি প্রায়ই শ্রবণ করিতেন। এইসব মজলিসের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখ—তারিখুল-আগামী ২—১৬৭, ৪—৩৫ ও ১০,৫—২৪ প্রভৃতি। ইহার

সম্বন্ধে এমাম এবনে-আবদুল বার বলিতেছেন :—

وكان لا يرى بسماع الغناء باسا

আবদুল্লাহ-এবনে জাফর সঙ্গীত শ্রবণ করাতে কোন দোষ মনে করিতেন না। (এস্তীআব ১—৩৪২)।

(২) আবদুল্লাহ এবনে-জোবের নো'মান-এবন্থুল বশীর আনছারী, খলিফা ওমর এবনে-আবদুল আজিজ, আমির মাআভিয়া, আবদুল্লাহ-এবনে-আব্বাছ, এমাম হুছাএনের কন্যা বিবি ছোকায়না (ছকিনা), তাল্হার কন্যা আয়েশা সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। দেখ—যথাক্রমে আগানী ১—১০১, ২—১৫৯, ৪—৩৫ ১—৩২। বিবি ছোকায়নার সঙ্গীত চর্চ্চার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখ—ঐ, ১—৯৭, ২—১২৫, ২—১৩২ এবং ১৪—১৫৮ হইতে ১৭১ পৃষ্ঠা। বিবি অয়েশার সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য দেখ ঐ, ১০—৫১ হইতে ৫৮ পৃষ্ঠা।

(৩) হজরত আনছ-এবনে- মালেক তাঁহার ভ্রাতা বরা-এবনে-মালেকের গান গাহিতে শুনিলেন—। একদুল-ফরিদ ৩—১৬১ পৃষ্ঠা।

(৪) দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর নাবেগাকে বলিলেন—তোমার গান আমাকে কিছু শুনাও! নাবেগা হজরত ওমরকে গান শুনাইলেন, (ঐ, ৩—১৬১)। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ-এবনে-ওমর সম্বন্ধেও এক পৃষ্ঠা পূর্ব্বে ঐরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

(৫) প্রথম দাবীর প্রমাণে হজরত রছুলে করীমের সময়ে ছাহাবা-দিগের সঙ্গীত-চর্চ্চার কথাও অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

(৬) এমাম এবনে-হজম ও এমাম মাওর্দ্দী আল-হাভী পুস্তকে বহু বহু ছাহাবা ও তাবেয়ীর সঙ্গীত-চর্চ্চার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু সে সমস্তের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা সম্ভবপর হইল না।

## তৃতীয় দাবীর প্রমাণ

(১) স্বনামখ্যাত মোহাদ্দেছ শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব বলিতে-ছেন:—বিশ্বস্ততম কথা এই যে, এমাম আবু হানিফার মজহাবে নির্দ্দোষ সঙ্গীত শ্রবণ করা জাএজ। বহু সংখ্যক হাদিছ ইহার সমর্থন করিতেছে। ( মাজমুআ-খামছা—রাছাএল ১৯ পৃষ্ঠা )।

(২) এমাম আবুহানিফা প্রতি রাত্রে নিজের এক প্রতিবেশীর নিকট সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। (তাজকেরাতুল-হামদাভিয়া )।

(৩) আল্লামা আবতুল গনী নাবলসী হানাফী এই কথার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—একদিন সেই প্রতিবাসীকে খুঁজিয়া না পাওয়ায় অনুসন্ধানে জানা গেল যে, আমীর আইনী তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এমাম ছাহেব ইহা শুনিয়া ঐ গায়ক প্রতিবেশীর মুক্তির জন্য স্বয়ং আমীরের নিকট তশরিফ লইয়া যান। অমীর তাঁহাকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া এমাম ছাহেবকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। এমাম ছাহেব বলিলেন, তাঁহার নাম আমর, এবং ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া আসেন। তাহার পর জানা গেল—আমর নামের বিভিন্ন লোক কারাগারে আবদ্ধ আছে। আমীর তখন অগত্যা সব আমরকেই মুক্তি দিবার আদেশ করেন। আল্লামা নাবলসী এই ঘটনার কথা উল্লেখ করার পর বলিতেছেন—ইহাদ্বারা এমাম ছাহেবের সঙ্গীত শ্রবণের কথা সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

(৪) মোল্লা আলী কারী হানাফী তাঁহার ছেমা' বা সঙ্গীত সংক্রান্ত পুস্তকে বলিতেছেন—নির্দ্দোষ সঙ্গীত শ্রবণ করার সিদ্ধতা এমাম আবু-হানিফা, এমাম মালেক এমাম শাফেয়ী ও এমাম আহমদ-বেন-হাম্বল হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

(৫) এমাম আবু-ইউছফ খলিফা হারুনর্-রশীদের মজলিসে সঙ্গীত

শ্রবণ করিয়া অনেক সময় ( ভাবে বিভোর হইয়া ) অশ্রুপাত করিতেন। তাঁহাকে সঙ্গীতের মছলা জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি আবুহানিফা ছাহেবের ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেন - সঙ্গীত নাজাএজ হইলে এমাম ছাহেব কখনও প্রতি রাত্রে নিজের সময় নষ্ট করিতেন না।

(৬) এমাম আহমদ তাঁহার পুত্রের মজলিসে উপস্থিত হইয়া জনৈক গায়কের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে পর, পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা! আপনি ত সঙ্গীতকে জাএজ মনে করিতেন না! এমাম ছাহেব উত্তরে বুঝাইয়া দেন যে, যে সঙ্গীত পাপ প্রবৃত্তির উত্তেজক—তাহাই কেবল নিষিদ্ধ।

(৭) এমাম আহমদ সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন এবং ভাবে বিভোর হইয়া নানাপ্রকার আনন্দ-প্রকাশক অঙ্গভঙ্গি করিতেন—ইহা বিভিন্ন রেওয়ায়ত হইতে প্রমাণরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। এমাম এবনে-জওজীকে পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। (তাবলিছ ২৫৯ পৃষ্ঠা)।

(৮) এমাম মালেক স্বয়ং গান গাহিতেন, অন্যের গান শ্রবণ করিতেন এবং রাগ-রাগিণীর ক্রটী হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তরে বলেন—নিতান্ত অজ্ঞ, অকাট মূর্খ ও হৃদয়হীন লোক ব্যতীত সঙ্গীতকে অন্য কেহ হারাম বলিতে পারে না।

(৯) এমাম শাফেয়ীর সঙ্গীত শ্রবণেরও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আজাবীর আলী-কারী, নাবলসী, গজালী প্রভৃতি দেখ।

## চতুর্থ দাবীর প্রমাণ

স্বনামধন্য এমাম এবনে-হাজম, হজরত শেখ শেহাবুদ্দিন ছোহরাওয়ার্দ্দি, আল্লামা কাজী ঈছা اباحة الغناء, শেখ কামালুদ্দিন-এবনে-

জাওয়াজের ابطال دعوی الاجماع فی احکام السماع, এমাম শওকানী رسالۃ سماع, মোল্লা আলী কারী الاجماع علی تحریم مطلق السماع প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া নির্দ্দোষ সঙ্গীত জাএজ হওয়া অকাট্যরূপে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এমাম গজালী بوارق السماع فی تکفیر من یحرم السماع নামক পুস্তকে সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, নির্দ্দোষ সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া ফৎওয়া দিলে শরিয়তের এন্‌কার করা হয় এবং এইরূপ মোন্‌কের কাফের হইয়া যায়। সঙ্গীতের সিদ্ধতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিরচিত এই শ্রেণীর পুস্তকগুলি ব্যতীত—বহু সংখ্যক এমাম ও আলেম বিভিন্ন পুস্তকে নির্দ্দোষ সঙ্গীতের সিদ্ধতার কথা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উদাহরণ স্থলে এমাম গজালীর কিমিয়ায়-ছাআদৎ ( رکن دوم ' اصل هشتم ) ও এহয়াউল-ওলুম ( ২য় খণ্ড ১৩৮ হইতে ২১০ পৃষ্ঠা ), এবনুল-আরাবীর কেতাবুল-আহকাম, এমাম মাওর্দ্দীর হাভী-কবির, শাহ আবদুল-হক মোহাদ্দেছ দেহলভীর নেকাতুল-হক মাদারেজুন-নবুয়ত প্রভৃতি পুস্তক, আল্লামা আইনীর হেদায়ার টীকা ও অন্যান্য বহু পুস্তকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শাহ মোহাম্মদ কাদেরী চিশ্‌তি হানাফী জনপুরী تحفة الفقیر فی اباحة السماع و المزامیر নামে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে হানাফী মজহাবের বহু এমাম ও আলেমের এবং হানাফী ফেকাঃ শাস্ত্রের অনেক বিখ্যাত পুস্তকের অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে। সুফী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত পীরে তরিকৎ এবং সর্ব্বজনমান্য সাধকগণের মতামতের উল্লেখ করা এখানে অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি, কারণ তাহা সকলের বিদিত।

## উপসংহার

আমাদের কতিপয় বন্ধু কিছুদিন হইতে নিয়মিতভাবে প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন যে, এছলামের কতকগুলি বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া এখন খুব আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরাতন এছলাম বর্ত্তমানের এই নূতন দুনিয়ায় আর চলিতে পারে না। এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা নব্য-তান্ত্রিকদের সম্মুখে কতকগুলি সমস্যা উপস্থিত করিতে থাকেন। ইহার উত্তরে আমাদের দাবী এই যে, এছলাম প্রাকৃতিক ধর্ম্ম এবং প্রকৃতির ন্যায়ই তাহা চির-শাশ্বত ও চির-সচল। মানুষের সংস্কারের দরকার, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার এই বিধানে কখনও হয় নাই, কখনও হইবে না—হইতে পারে না। অন্যপক্ষের উত্তরে নিজেদের এই দাবীকে সপ্রমাণ করার জন্যই তাঁহাদের উপস্থাপিত সমস্যাগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে এই সন্দর্ভের অবতারণা। এই আলোচনা দ্বারা যদি অন্ততঃপক্ষে এইটুকু বুঝাইতে পারিয়া থাকি যে, এছলামের কোন বিশ্বাস বা বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত না করিয়া, হঠাৎ তাহাকে অচল ও পরিবর্ত্তন-সাপেক্ষ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা অন্যায়, তাহা হইলে আমরা নিজেদের শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

সঙ্গীত জাএজ - একথা বলার পর, ন্যায়ের হিসাবে চিত্রের আর একদিকের—ব্যভিচার ও অপব্যবহারের দিকের—প্রতি, পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু, একে প্রবন্ধটী এমনই দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পর "চিত্র-সমস্যার" আলোচনা প্রসঙ্গেও সে কথাগুলি বিস্তারিতভাবে বলার আবশ্যক হইবে, সেই জন্য আজ এইখানেই পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

সঙ্গীত-সমস্যা প্রবন্ধের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর কএকজন ইংরাজী শিক্ষিত যুবক আমাদিকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের ধন্যবাদে বর্ত্তমানে বিশেষ কোন আনন্দ উপভোগ করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা আরজ করিয়া রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমাদের একদল যুবকের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা স্বেচ্ছাচারের ভাব বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে এছলামের অনুগত না করিয়া এছলামকেই নিজেদের প্রবৃত্তির অধীন করিয়া রাখিতে চান। এইজন্য নিজেদের প্রবৃত্তির অনুকূলে কোন ব্যবস্থা এছলামে পাওয়া গেলে, তাঁহারা তাহা লইয়া খুবই হুলস্থুল করিতে থাকেন; কিন্তু, এছলামের যে কথাগুলি তাঁহাদের প্রবৃত্তির উদ্দাম গতিকে বারিত ও প্রতিহত করিতে চায়-- তাহাকে তাঁহারা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া অমান্য করিতে একবিন্দুও দ্বিধা বোধ করেন না। এই শ্রেণীর বন্ধুদের ধন্যবাদের কোন মূল্যই যে আমাদের কাছে নাই, কর্ত্তব্যের অনুরোধে এ কথাটাও এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছি।

## কএকটা প্রাসঙ্গিক কথা

### (১)

সঙ্গীত, চিত্র বা এই শ্রেণীর অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে এছলামের ব্যবস্থার দিক দিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সময় তাহার কএকটা মূলনীতির কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলে জানিতে পারা যাইবে যে, দুন্‌য়ার কোন বস্তু বা বিষয় নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল বা অমঙ্গলের দ্বারা পরিপূর্ণ নহে। যে বস্তু বা বিষয় আমরা অতিশয় মন্দ ও অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে বরিয়া থাকি, তাহার মধ্যেও

হিত ও মঙ্গলের এক আধটুকু অংশ নিশ্চয় লুকাইয়া আছে। কিন্তু, দুনয়ার সমস্ত ন্যায়, সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্ম্ম, সেই বস্তু বা বিষয়কে বর্জ্জন করিয়া চলার জন্য মানুষকে উপদেশ দিয়া থাকে—কারণ সেই বস্তু বা সেই বিষয় হইতে মঙ্গল লাভের আশার তুলনায় অমঙ্গল ঘটার আশঙ্কা অনেক অধিক। একটা কোরআনের উদাহরণ দিতেছি।

ছুরা বকরার একটী আয়তে বলা হইতেছে :—"মদ ও জুয়ার বিষয় তোমাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে। বলিয়া দাও, ঐ বস্তু দুইটীতে গুরুতর পাপ ( নিহিত ) ও মানুষের কিছু কিছু উপকারও আছে, তবে মঙ্গল অপেক্ষা উহার অমঙ্গলই বৃহত্তর।" সুতরাং এই মদ ও জুয়াকে এছলামে হারাম করা হইয়াছে। অধিকতর সময় অধিকতর মানুষের পক্ষে যে বস্তু অধিকতর অনিষ্টজনক হইয়া থাকে, তাহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দিতে হইবে, দুই একজন লোক সময় সময় তাহাদ্বারা এক আধটুকু উপকার লাভ করিতে পারিলেও তাহা নিষিদ্ধ। উদ্ধৃত আয়তে এই নীতির কথা খুব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শরিয়তের ইতিহাসে আমরা ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে, এই প্রকার কোন একটা বিষয়কে, সাময়িক অবস্থা বিচারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। আবার সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়টাকে জাএজ বা সিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। ইহারও একটা উদাহরণ দিতেছি। এছলাম মদকে হারাম বলিয়া ঘোষণা করার পর, হজরতের ছাহাবীগণ মদের পাত্রগুলি পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে থাকেন। কোরআনের আদেশে হঠাৎ মদ ত্যাগ করার পর, ঐ পাত্রগুলির ব্যবহারের সময় অনেকের মনে মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতে থাকে। এই সময় হজরত ঘোষণা করিয়া দিলেন—"আজ হইতে মদের পাত্রগুলির ব্যবহারও নিষিদ্ধ হইল।"

তাহার পর ক্রমে ক্রমে সকলের নেশার মোহ ভাল করিয়া কাটিয়া গেলে, হজরত আবার ঘোষণা করিয়া দিলেন—মদের পাত্রগুলির ব্যবহার করাতে এখন আর কোন দোষ নাই। ( মোছলেম, আবুদাউদ, তিরমিজী প্রভৃতি )। এই নজিরের দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে, কতকগুলি বস্তু বা বিষয়ে মূলতঃ তাহার হারাম হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকে, আর কতকগুলি বস্তুতে মূলতঃ ঐরূপ কোন কারণ বিদ্যমান থাকে না। কেবল বাহিরের ও সাময়িক অবস্থা-গতিকে কখন্ তাহা দোষযুক্ত এবং কখন্ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যেমন মদ্যে ও মদ্যপাত্রে। প্রথম শ্রেণীর বিষয়গুলিকে এছলাম চিরস্থায়ীভাবে হারাম করিয়া দিয়াছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয়গুলি সম্বন্ধে আনুসঙ্গিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা দিয়াছে। প্রথমটি শরিয়ত এবং দ্বিতীয়টী قضا কাজা। শরিয়ত হইতেছে অপরিবর্ত্তনীয়, চিরস্থায়ী ধর্ম্ম ব্যবস্থা, আর কাজার অবস্থা-ভেদে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে বা ঘটিতে পারে। এই দুইটী নজীরকে সম্মুখে রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সঙ্গীত-সমস্যা, চিত্র-সমস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা সঙ্গত, অথচ শাস্ত্রসম্মত, সমাধানে উপনীত হওয়া আমাদিগের পক্ষে সহজসাধ্য হইতে পারে।

এই দুইটী নীতি অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলে চিত্রের অন্যদিক—ব্যভিচারের দিকটা আমাদের সম্মুখে প্রস্ফুট হইয়া উঠিবে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিচার দ্বারা যদি সম্যকরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যায় যে, অধিকাংশ লোক অধিকাংশ সময় এরূপ সঙ্গীতে এবং এরূপভাবে সঙ্গীতের চর্চ্চায় লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, যাহাতে তদ্দ্বারা তাহাদের ইষ্টের আশা অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ অধিকাংশ লোক সঙ্গত ও অসঙ্গতের বিচারশক্তি বর্জ্জিত হইয়া এমন সঙ্গীত লিপ্ত ও আসক্ত হইয়া পড়িতেছে—যাহাতে ধর্ম্মের ও

নীতির হিসাবে তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী,—তখন উক্ত 'কাণ্ডার' হিসাবে সকল শ্রেণীর সমস্ত সঙ্গীতের বিরুদ্ধে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা সঙ্গত হইবে। শুধু সঙ্গীত বলিয়া কেন এবং শুধু এছলামের শরিয়ত বলিয়া কেন—দুন্য়ার সমস্ত রাজনীতি, সমস্ত অর্থনীতি, সমস্ত স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত আইন-কানুনের মূল ভিত্তিই হইতেছে এই নীতির উপর। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, যে সকল শ্রদ্ধাস্পদ আলেম প্রথমে সকল প্রকার সঙ্গীতকে নাজাএজ বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই নীতির অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন মাত্র। এছলামের খলিফা ও বাদশাহদিগের ক্রম-বর্দ্ধনশীল অসংযমের ইতিহাসে, আর সঙ্গীত সংক্রান্ত ফৎওয়ার ক্রম-বর্দ্ধনশীল কঠোরতার ইতিবৃত্ত যে যৌগপতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে পাঠকগণ বোধ হয় আমাদিগের এই বিশ্বাসকে অসঙ্গত বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। একজন লোক থিয়েটারে বেশ্যার মুখে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে, আর একজন নিতান্ত জঘন্য রুচির সঙ্গীত গান করিয়া নিজের ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানের মস্তকে পদাঘাত করিতেছে, অন্য একজন পৌত্তলিকতা সংশ্লিষ্ট ও অনৈছলামিক শিক্ষাপূর্ণ যাত্রাগান শ্রবণ করিয়া পরিতোষ লাভ করিতেছে। সঙ্গীত জাএজ, অতএব আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করার অধিকারও তাহাদের নাই। আমার মতে, সঙ্গীতকে সর্ব্বতোভাবে হারাম বলা যেমন অন্যায়, সঙ্গীত জাএজ বলিয়া সকল প্রকারের নিষিদ্ধ সঙ্গীতকে চালাইয়া দেওয়ার চেষ্টা তদপেক্ষা অধিক অন্যায়। যাহারা যথাক্রমে নিজেদের সংস্কার বা প্রবৃত্তি মাত্রকে অনুসরণ করিয়া সব সঙ্গীত হারাম বা সব সঙ্গীত হালাল করিয়া লইতে ব্যতিব্যস্ত, উভয় দিককার সেই সকল চরমপন্থীদিগের কথা বাদ দিয়া—যাঁহারা কেবল এছলামের সত্যকার ব্যবস্থার অনুসরণ

করিতে চান, সঙ্গত ও অসঙ্গত সঙ্গীতের মধ্যস্থ শরিয়তের সীমান্তরেখাকে তাঁহারা কখনই অতিক্রম করিতে পারিবেন না। খাসি ছাগলের গোশ্‌ত খাওয়া এছলামে জাএজ, অতএব হবিবুল্লা গাজীর বড় খাসি চুরি করিয়া আনিযা ও তাহার গোশ্‌ত খাওয়া জাএজ হইবে—এরূপ কথা যাহারা বলিতে পারে, তাহারা মানুষ হিসাবে গণনার গণ্ডীর মধ্যে আসিতে পারে না।

( ২ )

মানুষ কতকগুলি রিপু ও ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে লইয়া দুন্‌য়ায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সেই রিপু ও ইন্দ্রিয়গুলিও আল্লার সৃষ্টি। সুতরাং সেগুলিকে সঙ্গত ও সংযতভাবে ব্যবহার করার অনুমতি—বরং আদেশ —তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। যেহেতু মানব-সাধারণ এই সঙ্গত-অসঙ্গতের সীমা-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে অনেক সময়ই বিচার-বিভ্রমের পরিচয় দিয়া থাকে, সেইজন্য করুণাময় আল্লাহতাআলা শাস্ত্র ও শরিয়ত দ্বারা প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গত ও সংযত সদ্ব্যবহার এবং অসঙ্গত অপব্যবহারের মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমান্তরেখা টানিয়া দিয়াছেন। সেই রেখাকে অতিক্রম করিলেই মানুষ হিসাবে আমাদের পতন ঘটিয়া থাকে। এছলাম প্রাকৃতিক ধর্ম্ম—কোর্‌আনের এ-দাবী নিশ্চয়ই সত্য। সুতরাং ইহাও নিশ্চিত সত্য যে, সকল শ্রেণীর সকল সঙ্গীতকে এছলাম সকল অবস্থায় কখনই হারাম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারে না।

এখানে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন রিপু বা ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়া, আর মানুষকে তাহার অযথা ব্যবহারের আদেশ করা—এ-দুয়ের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। মানুষের প্রবৃত্তি এবং তাহার মধ্যস্থ খোদাদত্ত প্রকৃতি, মূলতঃ একই জিনিস।

অতএব, তাহার কোন একটা প্রবৃত্তিকে সদসৎ নির্ব্বিচারে দলিত-মথিত করিতে যাওয়া, আর তাহার মধ্যকার সেই প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করাও এক কথা। আল্লাহ কোর্‌আনে পুনঃপুন বলিয়া দিতেছেন যে—"প্রকৃতির ধর্ম্ম অমোঘ।" তাহাকে আঘাত করিলে সে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং জ্ঞান-বিভ্রম ও বিবেকের বিকারকে আশ্রয় করিয়া তাহার মধ্যে ঐ আঘাতের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়। তখন শরিয়তের নির্দ্ধারিত সীমান্তরেখাকে অমান্য করিয়া মানুষের বিদ্রোহী লালসা অযথা ও অসঙ্গতভাবে তাহাকে সম্ভোগ করিবার জন্য অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠে। চিন্তাশীল পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, ইহা মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত একটা গূঢ় ও গভীর সত্যকথা। দুন্‌য়ার সকল শ্রেণীর সকল প্রকার বিদ্রোহের মূল এইখানে—এই সঙ্গত অধিকার দানে অসম্মতির মধ্যে। প্রকৃতির ধর্ম্ম এছলাম, এই আল্লারই দেওয়া মানব-প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া মানুষকে শরিয়তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিয়াছে, একথা যাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন, প্রকৃত এছলামকে তাহার যথারূপে দর্শন করার বিশেষ চেষ্টা তাঁহারা কখনই করেন নাই। নিজের যুবক পুত্রকে বিবাহিত জীবন উপভোগ করিতে যে পিতা নিষেধ করেন—আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সচ্চরিত্র দেখার আশাও পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহার আদেশ নিশ্চয়ই লঙ্ঘিত হইবে—তাঁহার আশা নিশ্চয়ই বিফল হইবে। প্রকৃতপক্ষে তিনি যুগপৎভাবে নিজপুত্রের ও সচ্চরিত্রতার সাধারণ শত্রু—তিনি তাহাকে নিজেই অসচ্চরিত্র হইতে বাধ্য করিতেছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এ-সম্বন্ধে এছলাম মুছলমানকে যতটা অনুমতি দিয়াছে, তাহাকে সেটুকু হইতে বারিত করিতে গেলে উল্টা উৎপত্তি হওয়া নিশ্চিত।

## (৩)

এই সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার সময়, বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাস্ত্রের সম্মান ও সংস্কারের সম্মোহন—দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। এই দুইটী বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অধিকাংশ সময়ই অজ্ঞতার বা অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে মোছলেম-বঙ্গের আরবী ও ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহারও মূলীভূত কারণ হইতেছে উভয়পক্ষের সযত্ন-পোষিত এই অজ্ঞতা। একদল শাস্ত্র বলিয়া সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন, আর একদল সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রকেও বিসর্জ্জন দিতে চাহিতেছেন। ইহার সমাধানের একমাত্র উপায়—শাস্ত্র ও সংস্কারকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইয়া দেওয়া। কিন্তু, যাঁহারা নিজেদের সংস্কারের সম্মোহনকে শাস্ত্রের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিতে অভ্যস্ত, এ-সমাধানের নামে তাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া এই সমাধান-প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করিতে থাকেন। এই অবস্থার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, জাতির সংস্কারে যখন আঘাত না লাগে, সে অবস্থায় শত শত গুরুতর শাস্ত্র ব্যবস্থাকে তাহারা স্বচ্ছন্দে অমান্য করিয়া চলে এবং সেজন্য তাহাদের অন্তঃকরণে কোন প্রকার অনুশোচনা আসে না বা উত্তেজনার উদ্রেক হয় না। পক্ষান্তরে, যে সংস্কারটা তাহাদিগের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে—শাস্ত্রসঙ্গত হউক বা না হউক—তাহাতে সামান্য একটু আঘাত লাগিতে দেখিলে তাহাদের চাঞ্চল্যের আর অবধি থাকে না। তখন তাহারা নিজেদের সংস্কারকে রক্ষা করিতে চায়—শাস্ত্রের ভাণ করিয়া। শাস্ত্র ও শরিয়তকে রক্ষা করিতে হইলে এই শাস্ত্রের ভাণ

ও সংস্কারের সম্মোহনকে সমাজ হইতে সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে—এবং ইহাই হইবে বর্ত্তমান যুগের প্রত্যেক এছলাম-সেবকের সর্ব্বপ্রথম সাধনা ও সর্ব্বপ্রধান জেহাদ। এই সাধনায় যে সঙ্কট আছে, এই জেহাদে যে বিপদ আছে—এছলামের নামে এবং তাহার নিকট ভবিষ্যতের স্বর্ণ যুগের আশায় সেগুলিকে সহিয়া বহিয়া নিজের যাত্রা-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যথায় মুছলমান হিসাবে বাঁচিয়া থাকা এ-জাতির পক্ষে সম্ভবপর হইবে না—মোছলেম জগতের দিকে দিকে প্রকট, কালের নিত্য-নূতন তীব্র-কঠোর কশাঘাতকে উপলক্ষ্য করিয়া আল্লার অমোঘ ন্যায়-বিধান আমাদের বধিরপ্রায় কর্ণ-কুহরে এই সত্যকে রুদ্র-ভীষণ বজ্র-নির্ঘোষে সততই জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

শাস্ত্রের সম্মানের নামে এই শ্রেণীর সংস্কারের সম্মোহন মুছলমান সমাজকে কিরূপে গ্রাস করিতে বসিয়াছে, চিন্তাশীল পাঠকগণ একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, সামাজিক জীবনের প্রত্যেক কেন্দ্রে এবং আমাদিগের এই ধার্ম্মিকতার দাম্ভিকতার প্রত্যেক স্তরে, তাহার প্রচুর নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। এই সেদিন "নরপিশাচ নরাকারে সাক্ষাৎ ইবলিস" এবনে-ছউদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে ধর্ম্মের সম্মানের নামে যে হুলস্থূল বাধাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—তাহারও মূলে এই সংস্কারের সম্মোহন। এই উত্তেজনার মূল এই যে, এবনে-ছউদের বিজয়ী সৈনিকেরা মক্কা নগরে প্রবেশ করিয়া আমীর হামজার কবরের উপরকার কোব্বা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। এই কোব্বা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জোব্বাগুলির সূত্রে সূত্রে ধার্ম্মিকতার উৎকট তড়িৎ তরঙ্গ বহিয়া গেল এবং আমরা এবনে-ছউদের ও মক্কাবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করার জন্য হজ বন্ধ করিয়া দিতে, এমন কি, ইংরাজের দ্বারা পবিত্র হেজাজ-ভূমি আক্রমণ করাইবার চেষ্টা করিতেও প্রস্তুত হইয়া

গেলাম। কিন্তু, এই ধার্ম্মিকতার দাম্ভিকতা ও সংস্কারের শোচনীয় সম্মোহনের ফলে আমাদিগের মধ্যকার একজন লোকও একথা স্মরণ করিবার অবকাশ পাইল না যে, বস্তুতঃ মক্কাতে আমির হামজার কবর থাকা সম্ভব কি না? আমীর হামজা শহীদ হইলেন ওহোদ যুদ্ধে এবং মদিনার নিকটবর্ত্তী সেই ওহোদ প্রান্তরের গঞ্জে-শহীদাঁর মধ্যেই ত তাঁহার সমাধি রচিত হইয়াছিল। তবে, মক্কায় আমীর হামজার কবর আসিল কোথা হইতে? সংস্কারের সম্মোহন এমন ব্যাপক এবং এত গভীরভাবে আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে আবিষ্ট অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে, এই সামান্য প্রশ্নটার কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখার অবসর, এত বড় একটা জাতির মধ্যে কাহারও ঘটিয়া উঠিল না! তাহার পর, বাস্তবিকই যদি ঐটী সত্যকার আমীর হামজার কবর হইত, তাহা হইলেও এছলামের পক্ষ হইতে একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত ছিল যে, পাকা কবর ও তাহার উপর এমারত ও গুম্বজ নির্ম্মাণ করা এবং সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলা—এই দুইটা কাজের মধ্যে শরিয়তের ব্যবস্থায় কোন্‌টী মহাপাপ, আর কোন্‌টী মহাপুণ্যজনক?

সঙ্গীত সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেও এই সম্মোহনের স্পষ্ট নজির পাওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত ওয়াএজ ও আলেমদিগের ওয়াজ নছিহত শ্রবণ করার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছে, তাঁহারা দেখিয়াছেন—ওয়াএজ ছাহেব হাম্‌দ নাআৎ ও কোর্‌আনের দুই একটা আয়ত পাঠ করার পর, "মাওলানা ফরমাতে হেঁ"—বলিয়া "মছনভী শরীফ" আবৃত্তি আরম্ভ করিয়া দেন। এই সময় যেরূপ স্বর-তান-মান-লয় সহকারে, কখনও পঞ্চমে কখনও সপ্তমে চড়িয়া, আবার কখনও বা খাদে নামিয়া, তাঁহারা যেরূপ মধুরভাবে 'মছনভী শরীফ' গান করিয়া থাকেন, তাহা সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই নহে। অথচ, ইহাতে কাহারও

ধার্ম্মিকতায় কোন আঘাত লাগে না, বরং সকলে ধর্ম্মজ্ঞানেই তাহাঁকে উপভোগ করিয়া থাকেন। আমাদিগের পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে যিনি জীবনে একবারও মীলাদ শরীফের মজলিসে উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা কোন ভাল মৌলুদখাঁর গজল শ্রবণ করার সৌভাগ্য যাঁহাদের কখনও ঘটিয়াছে, ন্যায়ের অনুরোধে তাঁহারা সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ঐগুলি প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই নহে। অথচ, ইহাকে সকলেই জাএজ বলিয়াছেন—ইহা শ্রবণ করিয়া নিজেদের উর্দ্ধতন সাত পুরুষ ও অধস্তন সাত পুরুষকে বে-হেছাব বেহেশ্‌তে দাখিল করাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়া অশেষ আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতেছেন। অধিকন্তু, সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক মৌলুদের কেতাবে এমন সব ভীষণ কথা লিখিত হইয়া আছে, তাওহীদের উপাসক মুছলমানের পক্ষে যাহা অকথ্য ও অশ্রাব্য। তবুও তাহা চলিয়া যাইতেছে এবং শ্রেষ্ঠতম পুণ্যকর্ম্ম হিসাবেই চলিয়া যাইতেছে! কিন্তু, আল্লার উপাসনা, মোনাজাত ও খাঁটী তাওহীদমূলক একটা গান বাংলায় গাহিলে "ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করা হইতেছে" বলিয়া তাঁহারাই আবার গায়কের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা প্রদান করিবেন। ইহাই ইহতেছে শাস্ত্রের ভাণ এবং শাস্ত্রের সম্মানের নামকরণে ইহাই হইয়াছে—আমাদের সংস্কারের সম্মোহন।

হজরত শেখ নেজামুদ্দিন আওলিয়া, মুছলমান সমাজে ছোল্‌তানুল্‌ আওলিয়া বা সমস্ত অলি দরবেশগণের সম্রাট বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। নেজামুদ্দিন আওলিয়া সঙ্গীতের খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য সম্রাট গিয়াছুদ্দিন তোগলকের সময় কতিপয় আলেমের সহিত তাঁহার ঘোরতর মতবিরোধ আরম্ভ হয়। অবশেষে, এই বিষয়ের বিচার মীমাংসার জন্য রাজ-আদেশে আলেমদিগের এক সভা আহুত হয়। হজরত নেজামুদ্দিন আওলিয়া এই তর্ক-সভার বিবরণ প্রদানকালে

নিজেই বলিতেছেন—আমি সঙ্গীত জাএজ হওয়া সম্বন্ধে যখনই হজরত রছুলে করীমের কোন হাদিছ পেশ করি, মজলিসের আলেমগণ তখনই যথেষ্ট সপ্রতিভভাবে বলিয়া উঠেন—এদেশে হাদিছের উপর আমল চলে না, ফেকার কোন কেতাবের কোন রেওয়ায়েত পেশ না করিলে আমরা তোমার কথা শুনিতে প্রস্তুত নহি। কখন কখন তাঁহারা ইহাও বলিতে থাকেন যে, এই হাদিছের উপর এমাম শাফেয়ীর আমল, সুতরাং আমরা উহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। ঐতিহাসিক ফেরেশ্‌তা, নেজামুদ্দিন আওলিয়ার বিবরণ দিবার সময়, এই বাহাছের মজলিসেরও উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহার কএকটা আবশ্যকীয় স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ফেরেশ্‌তা বলিতেছেন :

قاضی رکن الدین رو بشیخ کرده گفت - اے درویش ! در بابت سرود و سماع چه حجت داری ؟ شیخ بحدیث نبوی متمسک گشت - قاضی گفت ترا بحدیث چه کار ؟ تو مرد مقلدی' روایتی از ابو حنیفه بیار' تا بمعرض قبول افتد - شیخ گفت - سبحان الله ! من حدیث صحیح مصطفوی نقل می کنم و تو از من روایت ابو حنیفه می خواهی !... بادشاه چون حدیث پیغمبر شنید متفکر شده هیچ نگفت -

অর্থাৎ—কাজী রোকনুদ্দীন, নেজামুদ্দিন আওলিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে দরবেশ! সঙ্গীত (জাএজ) সম্বন্ধে তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে? নেজামুদ্দিন তখন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার হাদিছ উপস্থাপিত করিলেন: ইহাতে কাজী ছাহেব বলিলেন—হাদিছের সঙ্গে তোমার কি দরকার? তুমি মোকাল্লেদ * মানুষ—আবু হানিফার

* যাহার কথা শরিয়তের চারিটি প্রমাণের মধ্যে একটীও নহে, বিনা প্রমাণে তাহার কথাকে মান্য করিয়া লওয়ার নাম—তকলিদ। যে তকলিদ করে, সে মোকাল্লেদ।

কোন রেওয়ায়েত পেশ কর, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। নেজামুদ্দিন আওলিয়া বলিলেন—ছোবহানাল্লাহ, আমি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার ছহি হাদিছ উদ্ধৃত করিতেছি, আর তুমি তাহার মোকাবিলায় আমার নিকট হইতে আবু হানিফার রেওয়ায়েত চাহিতেছ!…সম্রাট হজরতের হাদিছ শ্রবণ করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন এবং নেজামুদ্দিনকে আর কিছু বলিলেন না। *

বিজ্ঞ পাঠকগণ এখন নিজেরাই বিচার করিয়া দেখুন—শাস্ত্রের সম্মান, আর সংস্কারের সম্মোহনের মধ্যকার ব্যবধানটা কত বিশাল ও কত বিরাট—এবং এই তারতম্য সম্বন্ধে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞতার ফলে, আজ আমরা স্বধর্ম্মের কি ভীষণ সর্ব্বনাশই না করিতে বসিয়াছি। আমরা চাই, এই অন্ধ অনুকরণের এবং এই অন্ধ সংস্কারের সম্মোহনকে জাতির অন্তর হইতে সমূলে উৎপাটন করিতে—তাহার স্থলে আল্লাহ ও রছুলের প্রকৃত শরিয়তকে এবং তাহারই সত্যকার সম্মানকে অক্ষয় ও অব্যয়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে।

হে অন্তর্য্যামী আল্লামূল-গয়ুব! ইহা যদি তোমার এই অধম দাসের প্রাণের কথা হয়, তবে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের মত শক্তিও তুমি তাহাকে প্রদান কর!

আমীন! আমীন!!

* নওয়াব ছিদ্দিকুল-হাছান খাঁ মরহুম تقصار جيود الاحرار গ্রন্থে "মানাকেবুল-আওলিয়া" পুস্তকের বরাত দিয়া লিখিতেছেন :—

و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی دریں باب موافق نظام اولیاست -

অর্থাৎ—শেখুল-এছলাম এবনে তাইমিয়া এ-বিষয়ে (সঙ্গীত জাএজ হওয়া সম্বন্ধে) নেজামুদ্দিন আওলিয়ার সহিত একমত।

# চিত্রকলা ও এছলাম

## ( ১ )

কোন প্রকার জীবজন্তুর ছবি আঁকা বা মূর্ত্তিগড়া, অথবা ঐরূপ ছবি বা মূর্ত্তি ব্যবহার করা, এছলামের বিধান অনুসারে সিদ্ধ কি না, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে মোছলেম জগতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। আমি যতদূর অবগত আছি, মিছরের স্বনামখ্যাত আলেম মুফ্‌তী আবদুহু মরহুম সর্ব্বপ্রথমে যুক্তি-প্রমাণের দিক দিয়া এ-সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আলোচনা করেন। ইহার পর মুফ্‌তী ছাহেবের প্রধান শিষ্য আল্লামা রশীদ-রেজা তাঁহার 'আল-মিনার' পত্রে বিভিন্ন সময় এ-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হন। ইহা ব্যতীত, মিছর, সিরিয়া, ত্রিপলী প্রভৃতি মোছলেম রাজ্যগুলির কতিপয় বিখ্যাত আলেম, চিত্রকলা সম্বন্ধে কএকটা বিস্তারিত ফৎওয়া প্রচার করেন। ইহা লইয়া ঐ সব দেশে মুছলমানদিগের মধ্যে সাধারণভাবেও অনেক বিচার-আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং অবশেষে তাঁহারা সকলে মোটের উপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—জীবজন্তুর ছবি তোলা, আঁকা, ছাপা বা সেগুলির ব্যবহার করা এছলামের বিধান অনুসারে কখনই নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এমন কি, জীবজন্তুর মূর্ত্তিগড়া ও তাহার ব্যবহার করাও তাঁহাদের অনেকের মতে অসিদ্ধ নহে। অবশ্য তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে—কোন প্রকার পৌত্তলিকতার উদ্দেশ্যে যে চিত্র বা মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইবে, অথবা যে চিত্র বা

মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া জাতির মধ্যে কোনক্রমে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় লাভের আশঙ্কা থাকিবে, তাহা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

প্রধান প্রধান আলেমগণের এই সিদ্ধান্তের ফলে--ছবি তুলিতে, ছাপিতে বা তাহার ব্যবহার করিতে, ভারতবর্ষের বাহিরের মুছলমান-দিগকে বিশেষ কোন আপত্তি করিতে দেখা যায় না। মিছরের আলেমগণ, এমন কি, আল-আজহারের শেখ, মুফ্‌তী ও এমামরাও, নিজেদের ছবি উঠাইতে বা অন্যের ছবি ব্যবহার করিতে কোনই আপত্তি করেন না। সচিত্র সংবাদপত্রগুলি সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে পঠিত হইয়া থাকে।

আরবদেশে এখন ছোলতান এবনে-ছউদের রাজত্ব। এবনে-ছউদ ও তাঁহার দেশস্থ ( নজদ্‌বাসী ) মুছলমানগণ সর্ব্বত্রই অতিরিক্ত গোঁড়া ও অহাবী বলিয়া পরিচিত। "গোঁড়া" হউন বা না হউন, শরিয়তের বিধি-নিষেধগুলি যে তাঁহারা অতি কঠোরভাবে পালন করিতে ও করাইতে বিশেষ আগ্রহান্বিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আরব-দেশে এবং এহেন "কঠোর অহাবী শাসনে" মুছলমানদিগকে নিঃসঙ্কোচে ছবি উঠাইতে ও ব্যবহার করিতে দেখা যায়। মক্কা শরীফে দুইটা ফটোগ্রাফের দোকান বেশ ভালভাবে চলিতে দেখিয়া আসিয়াছি। আমি নিজে সেখান হইতে কএকখানা ছবি উঠাইয়া আনিয়াছি। এবনে ছউদের প্রধান মন্ত্রী হইতেছেন—শেখ আবদুল্লাহ-বেন-ছোলায়-মান, আর আরব গোত্রসমূহের প্রধান গবর্ণররূপে নিযুক্ত হইয়াছেন শরীফ হাজ্জা। বহুবার ইহাদের অফিসে ও বাড়ীতে যাতায়াত করার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ফটো তোলা বা রাখা সম্বন্ধে ইঁহাদের কোনই দ্বিধা দেখিতে পাইলাম না। এমন কি, হেজাজ গবর্ণমেণ্টের

প্রধান অফিসে গিয়া দেখিলাম—মন্ত্রী ছাহেবের মোলাকাতের ঘরে স্বয়ং ছোলতান এবনে-ছউদের বৃহদাকারের ছবিগুলি অবাধে শোভা পাইতেছে।

নজদের প্রধান আলেম এবং এখওয়ান (অহাবী) সম্প্রদায়ের শেখুল-এছলাম আল্লামা আবদুল্লাহ-বেন-বোলাএহেদ প্রভৃতির নিকট আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করি, বিরুদ্ধ মতের সমর্থক হিসাবে অন্যপক্ষের যুক্তি প্রমাণগুলির অবতারণা করিয়া ইঁহাদের কাজের নিন্দা করিতে থাকি। কিন্তু, ইঁহারা আমার কথাগুলির বিশেষ কোন গুরুত্ব না দিয়া, সেগুলি হাসি-ঠাট্টায় উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। একজন বলিলেন—"শেখ! দর্পণ ব্যবহার করা কি আপনারা হারাম মনে করেন?" আর একজন বলিলেন—"হজে আসার সময় যে নোট ও টাকা আনিয়াছিলেন, তাহাতে কি কাফের বাদশাহ্র মূর্ত্তি আঁকা নাই? সেই বোৎগুলি সঙ্গে লইয়া কা'বার হরমে প্রবেশ করিতেছেন কি করিয়া?" ফলতঃ সূক্ষ্ম বিচারের দিক দিয়া তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ কোন উপকার লাভ করিতে না পারিলেও, মোটের উপর ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, নজদের "অতি গোঁড়া" আলেমরাও ফটো-চিত্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দোষ বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের অবস্থা কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এদেশের আলেমগণ সাধারণতঃ ছবি তোলা, ছবি আঁকা, ছবি ছাপা ও ছবি রাখাকে মহাপাতক বলিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন! জীবজন্তুর ছবি তুলিলে বা তাহা ব্যবহার করিলে মানুষ ছাফ মোশরেক ও পৌত্তলিক হইয়া যায়, চরম দৃঢ়তার সহিত এই প্রকার কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেও একদল মৌলবী-মাওলানা উপাধিধারী ব্যক্তি দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। অন্যদিকে কএকজন ইংরাজী শিক্ষিত মুছলমান চিত্রকলার সূত্র ধরিয়া নিজেদের শিল্প

শাগরেদদিগকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, স্থবির-এছলাম এখানে অচল হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। সে আজ আর যুগধর্ম্মের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। অতএব, যুগধর্ম্মের সঙ্কেত অনুসারে পুরাতন এছলামকে নিজের দরকার মত কাটছাঁট করিয়া লওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। ফলে, এদেশে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে—আলেমদিগের সংস্কারের ও যুগ ধর্ম্মের হুজুগের মধ্যে।

আমার যতদূর স্মরণ হয়, স্বনামখ্যাত মৌলবী চেরাগ আলী ছাহেব এদেশে সর্ব্বপ্রথমে সাধারণ সংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। মৌলবী ছাহেবের প্রধান যুক্তির সারমর্ম্ম এই যে, কোর্‌আনে ছুরা ছাবার ১২ ও ১৩ আয়তে বর্ণিত হইয়াছে—"হজরত ছোলায়মানের জন্য باذن ربه আল্লার সম্মতিক্রমে تماثيل অর্থাৎ ছবি বা মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইত এবং 'আল্লার নবী হজরত ছোলায়মান তাহা ব্যবহার করিতেন।" পৌত্তলিকতা হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত মহাপাতক, সর্ব্বসম্মতিক্রমে আল্লার নবী ও রছুলগণ এই শ্রেণীর গোনাহে কবিরা বা মহাপাতক হইতে মাছুম। পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন করাই নবী-প্রেরণের এবং নবীগণের কর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও সাধনা। অথচ, কোর্‌আনের বর্ণনামতে স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, এই চিত্র বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ আল্লার অনুমতিক্রমেই হইয়াছিল এবং হজরত ছোলায়মান সেগুলির ব্যবহারও করিয়াছিলেন। চিত্র বা মূর্ত্তি প্রস্তুত করা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বতোভাবে মহাপাতক হইলে আল্লাহ্ তাহার অনুমতি কখনই দিতেন না এবং আল্লার নবী হজরত ছোলায়মান পৌত্তলিকতার সেই প্রতীকগুলির ব্যবহারও কখনও করিতেন না।

মৌলবী চেরাগ আলী ছাহেবের পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইহা লইয়া আর বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। ইহার ন্যূনাধিক দুই যুগ

পরে মাওলানা শিবলী, মাওলানা আবুল-কালাম আজাদ, মাওলানা ছৈয়দ ছোলায়মান প্রভৃতি কএকজন শক্তিমান আলেমের ছবি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহাতে হিন্দুস্থানের আলেম সমাজের মধ্যে সাময়িকভাবে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে, ঐ আলেমদিগকে "নায়চারী" উপাধি দিয়াই তাঁহারা স্বস্তিলাভ করেন। ইহার অব্যবহিত পরে এই ব্যাপারে একটা গুরুতর "বিপ্লবের" সৃষ্টি করিয়া দিলেন মাওলানা আবুল-কালাম আজাদ ছাহেব, তাঁহার চিরস্মরণীয় "আল-হেলাল" পত্রের মারফতে। মাওলানা আজাদের গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা, অপ্রতীম শাস্ত্রজ্ঞান, অসাধারণ প্রতিভা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অতুলনীয় সাহিত্যশক্তি, আলহেলালকে তখন "আলেম" ও "শিক্ষিত" সকলের পক্ষেই অপরিহার্য্য করিয়া তুলিয়া-ছিল। কিন্তু, সেই সঙ্গে সঙ্গে, উচ্চশ্রেণীর বিলাতী ম্যাগাজিনের মত, তাহা চিত্র-বৈচিত্র্যে শোভিত হইয়াও প্রকাশিত হইত। মাওলানা ছাহেব নিজে এ-সম্বন্ধে কোন প্রকার শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, মোছলেম-জগতের প্রধান প্রধান আলেম, মুফ্‌তী ও অন্যান্য শক্তিমান পুরুষদিগের ছবি আলহেলালে বহুলভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় হিন্দুস্থানের আলেমদিগের মধ্যে ইহা লইয়া একটা অস্বস্তি ও চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। অন্ধভক্তেরা বিনা বিচারে মাওলানা আজাদের কার্য্যের সমর্থন করিতে লাগিলেন, তক্‌লিদের পূজারীরাও বিনা বিচারে তাহার নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন—সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিল না। অবশেষে, মাওলানা ছৈয়দ ছোলায়মান নদভী ছাহেব এই অভাব পূরণ করার জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর

মাসের "মাআরেফ" পত্রে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে চিত্র-সংক্রান্ত মছলার শাস্ত্রীয় দিক সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হন। এই প্রবন্ধে বহু যুক্তি ও উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ছৈয়দ ছাহেব সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, চিত্র সম্বন্ধে আমাদের আলেমগণ সাধারণতঃ যে ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ এছলামের কোন বিধানই তাহার সমর্থন করে না। * এই প্রবন্ধটী প্রকাশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং হিন্দুস্থানের আলেমগণ তাহা পাঠ করার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন—কিন্তু, এযাবৎ তাহার কোন প্রতিবাদ তাঁহারা কেহই করেন নাই।

মোছলেম-জগতের মধ্যে ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলার মুছলমানদিগের এবং ইহার ভিতর আবার তাহাদের আলেম সমাজের অবস্থার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা শোচনীয় বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়—বাহিরের কোন ঝড়ঝাপটা তাহাদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না, তাহার খবরই কেহ বড় একটা রাখিতে চায় না। তাই বাহিরের, অথবা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এইসব বিচার,আলোচনা, আমাদের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন বা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কিন্তু, সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় ছবি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, আমাদের কএকজন আলেম নিজেদের ধর্ম্মপ্রীতি প্রতিপাদনের জন্য যথেষ্ট অধীরতা দেখাইতে লাগিলেন, এই সুযোগের সুবিধা লইয়া, মোহাম্মদী বয়কট করাইবার জন্য নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যটুকু তাঁহারা নিঃশেষে ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপারটা কাল-প্রভাবে কতকটা 'গা-সওয়া' হইয়া যাইতে না যাইতে, আমার সম্পাদকতায় মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশিত হইল—সচিত্র আকারে। আমার

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে ছৈয়দ ছাহেবের আলোচনা হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

এই 'কুমতি' দেখিয়া বাঙ্গলার আলেম সমাজের মধ্যে অনেকে সত্য-সত্যই মর্ম্মাহত হইলেন। আমার পরম ভক্তিভাজন ওস্তাদ বর্দ্ধমান নিবাসী মাওলানা নে'মতুল্লাহ ছাহেব, তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ, আমাকে এ-সম্বন্ধে একখানা পত্র লেখেন। ঐ পত্রে মাওলানা ছাহেব কতকগুলি হাদিছের উল্লেখ করিয়া, সে-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানিতে চান। তুইখানা সংবাদপত্র এই লইয়া আমাকে পুতুল-পূজক, মোশ্‌রেক প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই—তাঁহাদের বিশিষ্ট "খাঁটি মুছলমানী" গালগুলি ইহার উপর অধিকন্তু।

এই সব কারণে চিত্রকলা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু, নানা কারণে এতদিন তাহার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই। আল্লাহতাআলার সাহায্যে, "সমস্যা ও সমাধান" প্রবন্ধের এই আবশ্যকীয় অংশটা আজ মোছলেম-বাঙ্গলার চিন্তাশীল পাঠকগণের খেদমতে পেশ করিতে সমর্থ হইলাম। আমার প্রমাণ প্রয়োগে, বিচার-পদ্ধতিতে এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণে ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। সমাজের সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা সেই ভ্রম-প্রমাদগুলি ধরিয়া দিলে যৎপরোনাস্তি বাধিত হইব, তাঁহাদের মন্তব্যগুলি কৃতজ্ঞতার সহিত পত্রস্থ করিব এবং ভ্রম বুঝিতে পারিলে প্রকাশ্যভাবে নিজের মতামতগুলি প্রত্যাহার করিয়া লইব। যে সকল বন্ধু চিত্রকলাকে এছলামের সমস্যা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, এই আলোচনার প্রতি বিনীতভাবে তাঁহাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রবন্ধের দীর্ঘ ভূমিকা দেখিয়াই বোধ হয় কোন কোন পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি তাঁহাদের নিকট প্রথম হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাখিতেছি। আলোচ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি

রাখিয়া, তাহার সবদিগের সম্যক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রবন্ধের আয়তন হ্রাস করার দিকে লক্ষ্য রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

( ২ )

ভারতবর্ষের আলেমগণ সাধারণভাবে বলিয়া থাকেন যে, কোন জান্‌দার বস্তুর কোন প্রকার ছবি প্রস্তুত করা এবং তাহা ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে হারাম। এই প্রকারে কোন প্রকার জীব-জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি গঠন করা এবং তাহা ব্যবহার করাও, এছলামের বিধান অনুসারে সম্পূর্ণ-রূপে নিষিদ্ধ। এই সমর্থনের জন্য তাঁহারা যে সব হাদিছকে নিজেদের দলিলরূপে পেশ করিয়া থাকেন, নিম্নে তাহার পরিচয় দিতেছি ঃ

( ১ ) হজরত রছুলে করীম বলিয়াছেন ঃ

ان اشد الناس عذابا یوم القیامة المصوررن -

অর্থাৎ—কিয়ামতের দিন সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর আজাব হইবে তাহা-দের, যাহারা তছবির বা ছবি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ( বোখারী, মোছলেম )।

( ২ ) হজরত বলিয়াছেন ঃ

الذین یصنعون الصور یعذبون یوم القیامة - یقـــال لهـم احیوا ما خلقتم -

অর্থাৎ—ছবি নির্ম্মাণ করে যাহারা, কিয়ামতের দিন তাহারা দণ্ড-প্রাপ্ত হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা সৃষ্টি করিয়াছ—তাহাকে জীবন দান কর। ( বোখারী, মোছলেম )।

( ৩ ) হজরত বলিয়াছিলেন, আল্লাহ বলেন ঃ

و من اظلم ممن ذهب یخلق کخلقی - الحدیث -

অর্থাৎ—আমার সৃষ্টির মত 'সৃজন' করিতে যায় যে ব্যক্তি, তাহা অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে হইতে পারে? (বোখারী, মোছলেম)।

(৪) হজরত বলিয়াছেন—

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لا تصاوير -

অর্থাৎ—যে গৃহে কুকুর, অথবা ছবি থাকে ফেরেশ্তারা সে গৃহে প্রবেশ করেন না। (বোখারী, মোছলেম)।

(৫) বিবি আএশা একখানি চিত্রযুক্ত পর্দ্দা খরিদ করিয়াছিলেন, হজরত রছুলে করিম তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই মর্ম্মের বিভিন্ন হাদিছ। বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।

(৬) হজরত এবনে-আব্বাছ বলিয়াছেন—

فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر و ما لا روح فيه

অর্থাৎ—নিতান্তই যদি করিতে হয়, তবে গাছ-পালা বা ঐরূপ 'বে-জান' বস্তুর ছবি আঁকিতে পার। (বোখারী, মোছলেম)।

এই শ্রেণীর আরও কতকগুলি রেওয়ায়ত বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদিছগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদিছগুলির মধ্যে অল্প-বিস্তর ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও সেগুলির সারমর্ম্ম এইরূপ। সুতরাং তাহা উদ্ধৃত করার দরকার নাই। এই শ্রেণীর দলিলগুলির উপর নির্ভর করিয়া সকল প্রকার জীব-জন্তুর ছবি বা মূর্ত্তি প্রস্তুত করা এবং সেগুলিকে বাড়ীতে রাখা বা অন্য কোন প্রকারে ব্যবহার করাকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করা হয়।

এই হাদিছগুলি সম্বন্ধে কোন প্রকার সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আমি উহার মধ্যকার প্রথম পাঁচটীকে প্রামাণ্য দলিল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি। কিন্তু, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আরজ করিয়া রাখিতে

চাই যে, চিত্রের অন্য দিকটার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা কোন সত্যসন্ধ মুছলমানের পক্ষে উচিত হইবে না। হজরত রছুলে করিমের বহু হাদিছ এবং তাঁহার ও তাঁহার ছাহাবাগণের সময়কার অনেক ঘটনা হইতে এই নিষেধের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণও পাওয়া যায়। তবে কি হজরতের হাদিছগুলি পরস্পর অসমঞ্জস? আমাদের এমাম ও মোহাদ্দেছগণ কি এ-সব বিষয় লইয়া কখনও কোন আলোচনা করেন নাই? দুঃখের বিষয়, আমাদের ভক্তিভাজন আলেমগণ নিরপেক্ষ বিচার অপেক্ষা নিজেদের সংস্কারের অকালতটাই অধিক সময় করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য অন্যদিকের দলিল-প্রমাণগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ তাঁহাদের প্রায়ই ঘটিয়া উঠে নাই। অন্যথায় উপরোক্ত প্রশ্নগুলির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, অত সহজে ফৎওয়া প্রচার করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

( ৩ )

আমরা এখন সর্ব্বপ্রথমে হজরত রছুলে করিমের কতকগুলি ছহি হাদিছ এবং তাঁহার ছাহাবাগণের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে—

( ক ) সকল প্রকার ছবি ও মূর্ত্তির ব্যবহার সাধারণভাবে হারাম করা হয় নাই।

( খ ) হজরত রছুলে করিম জীব-জন্তুর চিত্র-সমন্বিত কোন কোন জিনিস স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন।

( গ ) তাঁহার পরিজনগণের মধ্যে ঐ প্রকার চিত্রিত পর্দ্দার এবং জীব-জন্তুর মূর্ত্তির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। হজরত রছুলে করিম সে বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও, কাহাকেও ঐগুলি ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন নাই।

(ঘ) হজরতের ছাহাবাগণও জীব-জন্তুর চিত্র-অঙ্কিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন।

(ঙ) সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে, জীব-জন্তু ব্যতীত, অন্যান্য বস্তুর ছবি আঁকা ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। হজরত রছুলে করিম ছলিব বা ক্রুসের ছবিগুলি ধ্বংস করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

(চ) হজরত রছুলে করিমের নির্দ্দেশ মতে, শের্ক বা পৌত্তলিকতার উপকরণমাত্রই নিষিদ্ধ, তাহা অচেতন বা উদ্ভিদ হইলেও নিষিদ্ধ। এইজন্য পাকা ও উঁচু কবরগুলি ধ্বংস করার আদেশও তিনি দিয়াছেন। পক্ষান্তরে, পৌত্তলিকতার উপকরণ বা সহায় না হইলে জীব-জন্তুর ছবি ও প্রতিমূর্ত্তি ব্যবহার করার অনুমতিও তিনি প্রদান করিয়াছেন।

(ছ) ভারতবর্ষের আলেমগণ চিত্র ও মূর্ত্তি সম্বন্ধে যেরূপ সাধারণভাবে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা এমাম মোহাদ্দেছ ও হাদিছের টীকাকারগণের সিদ্ধান্তের বিপরীত।

এই সকল দলিল-প্রমাণ এবং যুক্তি ও উক্তি লইয়া বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, একটা বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সকলেই জানেন—এছলাম একদিনেই দুনয়ায় প্রচারিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হজরত রছুলে করিমের দীর্ঘ ২৩ বৎসরের নবী-জীবনে অল্প অল্প করিয়া ত্রিশ পারা কোর্-আন অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই দীর্ঘ ২৩ বৎসরের সময় ধরিয়া হজরত রছুলে করিম ক্রমে ক্রমে আরবজাতির কুপ্রথাগুলির সংস্কার করিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে এছলামের সব মহিমায় গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছিলেন। কোর্-আন প্রথমে মাদকতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়। এইরূপে আরবদিগের চিন্তাধারার

গতি পরিবর্ত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে আদেশ হইল—মাতাল অবস্থায় নামাজ পড়া অন্যায়। অথচ, নামাজ পরিত্যাগ করা মহাপাপ। এই সমস্যার মধ্য দিয়া তাহারা সংযমে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া গেলে আদেশ হইল—সকল প্রকার মাদকদ্রব্য সর্ব্বতোভাবে হারাম। শুধু ইহাই নহে, হজরত রছুলে করিম সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করিলেন—মদের পাত্রগুলি ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। তাহার কিছুকাল পরে, যখন মাদকদ্রব্য ব্যবহারের অভ্যাস মুছলমানদিগের মধ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া গেল, তখন তিনি বলিয়া দিলেন,—এখন হইতে তোমরা আবার মদের পাত্রগুলি ব্যবহার করিতে পার। বহু আদেশ-নিষেধের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার মধ্যে বিভিন্ন স্তরের সন্ধান পাওয়া যাইবে। অনেক সময় বাহ্যতঃ মনে হয়, হজরত রছুলে করিম একই বিষয় পরস্পর বিপরীত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু, আদেশ-নিষেধের ঐ ঐতিহাসিক স্তরগুলির সন্ধান পাওয়ার পর সহজে দেখা যাইবে যে, হজরতের ঐ হাদিছগুলি পরস্পর বিপরীত নহে, বস্তুতঃ বিভিন্ন স্তরের উপযোগী বিভিন্ন অবস্থা ঐ হাদিছগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। 'সোণা ও রেশমী কাপড় স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ' এরূপ হাদিছও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এই মছলার ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, আরবদিগের শোচনীয় বিলাসিতা ও অপব্যয় দেখিয়া, হজরত রছুলে করিম প্রথমে নর-নারী উভয়ের জন্যই স্বর্ণ ও রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর পুরুষরা কতকটা সংযত হইয়া আসিলে, নারীদিগকে ঐগুলি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিলেন। আরবদিগের পৌত্তলিকতার মোহ দেখিয়া হজরত প্রথমে কবর জিয়ারৎ করাও নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কিন্তু, তাহাদের মধ্যে তাওহিদের শিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার পর, আবার তিনি আরবদিগকে কবর জিয়ারৎ

করার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই প্রকারের আরও অনেক নজীর হাদিছের কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। চিত্র অঙ্কন ও মূর্ত্তি গঠন সংক্রান্ত ব্যবস্থারও এইরূপ দুইটা স্তর আছে এবং দুই স্তরের জন্য হজরত দুইপ্রকারের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের আলেমগণ প্রথম স্তরের হাদিছগুলি গ্রহণ করিতেছেন এবং দ্বিতীয় স্তরের ও পরবর্ত্তী সময়ের হাদিছগুলিকে বর্জ্জন করিতেছেন, ইহাতেই যত সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

## ( ৪ )

## ( ১ ) চিত্রের অন্যদিক

যে হাদিছগুলির উপর নির্ভর করিয়া জীব-জন্তুর চিত্র প্রস্তুত করা ও তাহার ব্যবহার করাকে আমাদের দেশে সাধারণভাবে হারাম বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া হয়, উপরে তাহার আভাস দিয়াছি। এখন আমরা চিত্রের অন্যদিকটা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব—হজরত রছুলে করিমের যে হাদিছগুলি দ্বারা জীব-জন্তুর চিত্র ও মূর্ত্তি ব্যবহার করার অনুমতি প্রতিপন্ন হয়, তাহার মধ্য হইতে কএকটা হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া দিব। তাহারপর, হজরতের ছাহাবাগণের ও তাবেয়ীদিগের কএকটা নজীর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, তাঁহারা জীব-জন্তুর চিত্র নিজেরা ব্যবহার করিতেন, ব্যবহার করাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনেও করিতেন। নিম্নে সেই হাদিছ ও নজীরগুলি পরপর উদ্ধৃত হইতেছে :—

## বিবি আএশার হাদিছ

চিত্র বা তছবিরের নিষেধ সম্বন্ধে যে সব রেওয়ায়তকে প্রমাণরূপে পেশ করা হইয়া থাকে, বিবি আএশার পর্দ্দা সংক্রান্ত বিবরণটী তাহার মধ্যে প্রধান। বিভিন্ন মোহাদ্দেছ বিভিন্ন সূত্র পরম্পরা সহকারে বিভিন্ন

আকারে এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার খোলাসা এই যে, হজরত কোন সময় বিদেশে গমন করিলে বিবি আএশা একটা জীব-জন্তুর চিত্র-অঙ্কিত পর্দ্দা খরিদ করেন এবং সেটাকে কামরার কোন এক স্থানে লটকাইয়া দেন। হজরত বাড়ী আসিয়া এই পর্দ্দা দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যপক্ষ ইহা হইতে তছবিরের নিষেধ প্রমাণ করিতে চান। কিন্তু, আমার মতে এই হাদিছটী নিষেধের প্রমাণ কখনই হইতে পারে না। বরং ইহাদ্বারা তছবির ব্যবহারের স্পষ্ট অনুমতিই প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ সৌভাগ্যক্রমে বর্ণনাটা এখানে শেষ হয় নাই। এই সঙ্গে সঙ্গে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর, বিবি আএশা সেই পর্দ্দা কাটিয়া দুইটী গদী বা বালিশ প্রস্তুত করিলেন, হজরত তাহা ব্যবহার করিতেন—জীব-জন্তুর ছবিগুলি তাহাতে অবিকৃত আকারে বিদ্যমান ছিল। এখন আমরা হাদিছের মূল এবারত ও তাহার শাব্দিক অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমাদের দাবী সত্য কি না, ইহাদ্বারা পাঠকগণ তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

### ১ম হাদিছ—

বোখারী ও মোছলেমে বর্ণিত হইয়াছে, বিবি আএশা বলিতেছেন—

انها كانت قد اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل
فهتكه النبى صلعم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا فى البيت يجلس
عليهما -

তিনি তাঁহার কামরায় একটী পর্দ্দা লটকাইয়াছিলেন, সে পর্দ্দায় বহু তছবির ছিল। হজরত সেই পর্দ্দাখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; অতঃপর, আমি তাহাদ্বারা দুইটা বালিশ বা গদী প্রস্তুত করিলাম, ঐ দুইটী বাড়ীতে ছিল, হজরত রছুলে করিম তাহার উপর উপবেশন করিতেন।

২য় হাদিছ—

عن عايشة ان النبى صلعم خرج فى غزاة فاخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط فجذبه حتى هتكه ثم قال ان الله لم يامرنا ان نكسو الحجارة و الطين -

বিবি আএশা বলিতেছেন—কোন অভিযান উপলক্ষে হজরত বিদেশে গমন করেন। এই সময় আমি একটা পর্দা গ্রহণ করিলাম এবং তাহা দরজায় লটকাইয়া দিলাম। তাহার পর হজরত ফিরিয়া আসিয়া ঐ পর্দা দেখিয়া তাহা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, তাহার পর বলিলেন,—পাথর ও মাটীকে কাপড় পরাইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে আদেশ করেন নাই ( বোখারী, মোছলেম )।

৩য় হাদিছ—

বিবি আএশা বলিতেছেন—

كان لنا ستر فيه تمثال طائر و كان الداخل اذا دخل استقبله - فقال لى رسول الله صلعم حولى هذا فانى كلما دخلت ذكرت الدنيا -

আমাদের একটা পর্দা ছিল, ঐ পর্দায় পাখীর ছবি অঙ্কিত ছিল। কোন আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করিতেই ঐ পর্দাটা তাহার সামনে পড়িত। অতঃপর, হজরত আমাকে বলিলেন,—পর্দাটা সরাইয়া দাও। কারণ, যখনই আমি বাড়ীতে প্রবেশ করি ( ইহা দেখিয়া ) আমার দুনয়া স্মরণ হইতে থাকে ( মোছলেম, আহমদ )।

৪র্থ হাদিছ—

আনছ বলিতেছেন—

قال كان قرام لعايشة سترت به جنب بيتها فقال لها

النبی صلعم امیطی عنی فانه لا تزال تصاویره تعرض فی صلاتی -

বিবি আএশার একটী পর্দ্দা ছিল—যাহাদ্বারা তিনি ঘরের একদিক ঢাকিয়া রাখিতেন। পরে হজরত তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার নিকট হইতে পর্দ্দাটা সরাইয়া রাখ, কারণ, ইহার তছবিরগুলি আমার নামাজে বিঘ্ন উপস্থিত করে" ( বোখারী )।

**৫ম হাদিছ—**

বিবি আএশা বলিতেছেন—

انه کان له ثوب فیه تصاویر ممدد الی سهوة - و کان النبی صلعم یصلی الیه - فقال اخریه عنی قالت فاخرته فجعلته و ساید -

আমার একখানা তছবির-অঙ্কিত কাপড় ছিল, ঐ কাপড়খানা কামরার দেওয়ালে লম্বাভাবে ঝোলান থাকে। হজরত ঐ পর্দ্দার দিকে নামাজ পড়িতেন। অতঃপর, হজরত বলিলেন,—পর্দ্দাখানা সরাইয়া দাও! সে মতে আমি পর্দ্দাখানা সরাইয়া লই এবং তাহা দিয়া কএকটা বালিশ প্রস্তুত করি। ( মোছলেম )।

**৬ষ্ঠ হাদিছ—**

বিবি আএশা বলিতেছেন—

قدم رسول الله صلعم من سفر و قد سترت علی بابی درنوکا فیه الخیل ذوات الا جنحة فامرنی فنذعته -

আমি নিজের দরজাকে একটা পর্দ্দাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলাম—যাহাতে ডানাযুক্ত ঘোড়া ( অঙ্কিত ) ছিল। হজরত বিদেশ হইতে আসিয়া তাহা অপসারিত করিতে আদেশ করায় আমি তাহা অপসারিত করিয়াছিলাম ( মোছলেম )।

বিবি আএশার পর্দ্দা সংক্রান্ত হাদিছগুলি বিভিন্ন পুস্তকে ও বিভিন্ন রেওয়ায়তে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। উহার আবশ্যকীয় অংশগুলি উপরে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। একত্রে এই অংশগুলির বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, বিবি আএশার এই হাদিছের দ্বারা সাধারণভাবে জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করার নিষেধ প্রমাণ করিতে যাওয়ার মত হঠকারিতা আর নাই। এই চিত্রগুলি সম্মুখে লটকান থাকাতে হজরতের নামাজে বিঘ্ন উপস্থিত হইত, দুন্য়ার বিলাসস্মৃতিদ্বারা তাঁহার পারলৌকিক চিন্তার ক্ষতি হইত। এইজন্য তিনি ঐগুলিকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর বিবি আএশা যখন ঐ পর্দ্দা কাটিয়া বালিশ বা গদী প্রস্তুত করিলেন, তখন হজরত আর কোন আপত্তি করিলেন না, বরং স্বয়ং তিনি সেগুলি ব্যবহার করিতে থাকিলেন। জীব-জন্তুর ছবি হইলেই তাহার ব্যবহার করা শের্ক ও পৌত্তলিকতা হইলে, হজরত রছুলে করিম কখনও নিজে ঘোড়া ও পাখীর ছবিযুক্ত বালিশ ও গদী ব্যবহার করিতেন না।

সংস্কারের উপাসকগণ এখানে বলিয়া থাকেন যে, গদী তৈয়ারী করার সময় পর্দ্দার ছবিগুলির আকার বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্যই হজরত তাহা ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইহা তাঁহাদের অন্যায় অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। পর্দ্দা সংক্রান্ত রেওয়ায়তগুলির কোনস্থানে এই অনুমানের পোষকতার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ইহার বিপরীত, বিশ্বস্ত হাদিছগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে যে, পর্দ্দার ছবিগুলি ঐ সব গদীতে পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ অবিকৃতরূপেই বর্ত্তমান ছিল (দেখ—মোছনাদ-আহমদ, ৬ খণ্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা)। সুতরাং হজরত রছুলে করিম যে, স্বয়ং জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করিয়াছেন, এই সকল হাদিছ দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

( ৫ )

## ( ২ ) তছবির ও ফেরেশতা

বিবি আএশার পর্দা সংক্রান্ত হাদিছের আর একদিকের বিচার এখনও বাকি আছে। বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি এমামগণের সঙ্কলিত একটী রেওয়ায়তে দেখা যায়, কাছেম-বেন-মোহাম্মদ "আএশা হইতে" বর্ণনা করিতেছেন—তিনি ( আএশা ) একটা চিত্রাঙ্কিত পর্দা ব্যবহার করায় হজরত রছুলে করিম অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন :

ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور -

"যে গৃহে তছবির থাকে, ফেরেশতারা তাহাতে প্রবেশ করেন না।" টীকাকারগণ ফেরেশতাদের প্রবেশ না করার হেতুবাদ দিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন,—চিত্রগুলি নানা পাপের ও নানা অশ্লীলতার প্রতীক হয়, উহাদ্বারা আল্লার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়, বহু চিত্রের পূজা করা হয় ( নববী ২—২০০ পৃষ্ঠা )।

বিবি আএশার নামকরণে বর্ণিত পর্দা সংক্রান্ত হাদিছগুলির বিভিন্ন অংশের মধ্যে এত অধিক অসামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে, যাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ফেরেশতাদিগের প্রবেশ না করার বিবরণটী সেই গোলযোগের একটা প্রধান নিদর্শন। উপরের রেওয়ায়তে দেখা যাইতেছে, কাছেম-বেন-মোহাম্মদ "বিবি আএশা হইতে" ঐরূপ হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, এমাম মোছলেম সঙ্গে সঙ্গে আর একটা রেওয়ায়ত উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাদ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, বিবি আএশা ওরূপ কথা বলেন নাই। নিম্নে সম্পূর্ণ হাদিছটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

عن زيد بن خالد الجهنى عن ابى طلحة الانصارى قال سمعت رسول الله صلعم يقول لا تدخل الملايكة بيتا فيه كلب لا تماثيل - قال فاتيت عايشة فقلت ان هذا يخبرنى ان النبى صلعم قال لا تدخل الملايكة بيتا فيه كلب و لا تماثيل - فهل سمعت رسول الله صلعم ذكر ذلك ؟ فقال لا - و لكن ساحدثكم ما رأيته فعل - رأيته خرج فى غزاته فاخذت نمطا فسترته على الباب - فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية فى وجهه - فجذبه حتى هتكه او قطعه و قال ان الله لم يامرنا ان نكسو الحجارة و الطين - قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك على -

জএদ-এবনে-খালেদ জুহনী আবু-তালহা আনছারী হইতে বর্ণনা করিতেছেন, তিনি ( আবু-তালহা ) বলেন : আমি হজরতকে বলিতে শুনিয়াছি,—"যে গৃহে কুকুর, অথবা ছবি থাকে, ফেরেশতারা তাহাতে প্রবেশ করেন না।" জএদ বলিতেছেন : অতঃপর, আমি বিবি আএশার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম—আবু-তালহা আমাকে সংবাদ দিতেছেন যে, হজরত বলিয়াছেন,—"যে গৃহে কুকুর, অথবা ছবি থাকে, ফেরেশতারা তাহাতে প্রবেশ করেন না।" আপনি কি হজরতকে ঐরূপ কথা বলিতে শুনিয়াছেন? ইহাতে বিবি আএশা বলিলেন,— "না ( অর্থাৎ আমি হজরতকে ঐরূপ কথা বলিতে শুনি নাই ), তবে, আমি হজরতকে যাহা করিতে দেখিয়াছি, তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি : হজরত কোন অভিযান উপলক্ষে বাহিরে গমন করেন। আমি সেই সময় একটা পর্দ্দা সংগ্রহ করিয়া তাহা দরজার উপরে লটকাইয়া দেই। হজরত ফিরিয়া আসিয়া যখন এই পর্দ্দা দর্শন করিলেন,

আমি তাঁহার মুখে অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। তাহার পর হজরত ঐ পর্দ্দাটা টানিয়া লইয়া উহাকে ছিঁড়িয়া দিলেন ও বলিলেন,—"পাথর ও মাটীকে পোষাক পরাইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে আদেশ করেন নাই।" আএশা বলিলেন,—তাহার পর আমরা উহা কাটিয়া দুইটা গদী বানাইয়া লইলাম এবং তাহাতে খেজুর গাছের ছাল ভরিয়া লইলাম। অতঃপর, এজন্য হজরত আমাকে কোন দোষ দেন নাই।

পাঠকগণ দেখিতেছেন,—প্রথম রেওয়ায়তে বলা হইতেছে যে,—"যে গৃহে ছবি থাকে, ফেরেশতারা তাহাতে প্রবেশ করেন না"—এই উক্তিটী বিবি আএশা হজরতের জবানী বর্ণনা করিতেছেন, অর্থাৎ হজরতকে তিনি ঐরূপ বলিতে শুনিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু, ছহি-মোছলেমের এই রেওয়ায়তে স্বয়ং বিবি আএশার মুখে নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে যে, তিনি হজরতকে ঐরূপ কথা বলিতে কখনও শুনেন নাই। অতএব, বেশ দেখা যাইতেছে যে, ইহা পরবর্ত্তী রাবীদিগের প্রমাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং "তছবির ঘরে থাকিলে ফেরেশতারা তথায় প্রবেশ করেন না" বলিয়া তছবিরকে হারাম বলার কোনই হেতু থাকিতেছে না। বরং এই রেওয়ায়তদ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে যে, পর্দ্দা কাটিয়া গদী তৈরী করিয়া লওয়ার পর হজরত আর কোন আপত্তি করেন নাই। পর্দ্দার বেলায় হজরত কেন অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ উপরে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, যথাস্থানে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

একটু গভীর দৃষ্টি লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্তি হইলে সহজে দেখা যাইবে যে, ছবি সংক্রান্ত রেওয়ায়তগুলির অধিকাংশই নানাপ্রকার অসতর্কতা ও ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। পাঠকগণ উপরে জএদ-বেন-খালেদের রেওয়ায়তে দেখিয়াছেন—"আবু-তাল্‌হা আন্‌ছারী বলিয়াছেন,

আমি হজরতকে বলিতে শুনিয়াছি, ছবি থাকিলে ফেরেশতারা সে ঘরে প্রবেশ করেন না।" সুতরাং এখানে তর্ক উঠিবে যে, আএশা না শুনুন, আবু-তালহা আন্‌ছারী'ত হজরতকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়াছেন, তিনিও ত একজন ছাহাবী। সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্যের দ্বারা এই বিবরণটীর বিশ্বস্ততা সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

আবু-তালহা আন্‌ছারীর নামকরণে এই হাদিছটী এবনে-আব্বাছ কর্ত্তৃকও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু, এখানে আবু-তালহার উক্তি যে নির্ভুল-রূপে উদ্ধৃত হয় নাই, অন্ততঃপক্ষে উহা যে আবু-তালহার বর্ণিত সম্পূর্ণ হাদিছ কখনই নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বোখারী, মোছলেম ও আবু-দাউদের একটী রেওয়ায়ত আমরা প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতেছি:—বোকাএর বেন আশজ বলেন, বোছর-বেন-ছঈদ বলিয়াছেন, তিনি এবং ওবায়দুল্লাহ খওলানী জএদ-বেন-খালেদ জুহনীর মুখে শুনিয়াছেন, জএদ বলেন: আমি আবু-তালহার মুখে শুনিয়াছি, হজরত বলিয়াছেন,—"যে গৃহে তছবির থাকে, ফেরেশতারা তাহাতে প্রবেশ করেন না।" বোছর বলিতেছেন, ইহার কিছুদিন পরে জুএদ অসুস্থ হইয়া পড়ায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে যাই। সেখানে গিয়া দেখি—

فاذا نحن فى بيته بستر فيه تصاوير -

তাঁহার বাড়ীতে একটা পর্দ্দা এবং সে পর্দ্দায় বহু ছবি! আমি ইহা দেখিয়া ওবায়দুল্লাহকে বলিলাম, সেদিন না জএদ আমাদিগকে তছবির সংক্রান্ত হাদিছ বয়ান করিলেন! ওবায়দুল্লাহ তখন বলিলেন:

الم تسمعه حين قال الا رقما فى ثوب -

জএদ যখন বলিয়াছিলেন,—"কিন্তু যাহা কাপড়ে অঙ্কিত থাকে" সে কথাটা বুঝি তুমি শুনিতে পাও নাই? বোছর বলিলেন,—কই, আমি'ত তাহা

শুনিতে পাই নাই। ওবায়দুল্লাহ বলিলেন,—হাঁ, আমি শুনিয়াছি, তিনি ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

অতএব, সূক্ষ্ম বিচারের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে চোখ বন্ধ করিয়া, যদি আবু-তালহার বর্ণনাকে নির্দ্দোষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহার সার এই দাঁড়াইবে যে, জীব-জন্তুর ছবি যদি বস্ত্রে অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে সে ছবি ঘরে রাখিলে ফেরেশতাদিগের প্রবেশের আর কোন বাধা থাকে না। সুতরাং এই হাদিছ হইতে সাধারণভাবে সকল প্রকার ছবি ব্যবহারের নিষেধত কোনমতেই প্রমাণ হয় না, বরং উহাদ্বারা অন্ততঃ এক শ্রেণীর ছবি ব্যবহার করার স্পষ্ট অনুমতিই পাওয়া যাইতেছে। এই হাদিছে আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, আবু-তালহার এই হাদিছের রাবী হজরতের ছাহাবী জএদ-বেন-খালেদ জুহনী, শত শত আনছার ও মোহাজ্জের ছাহাবাগণের বিদ্যমান থাকার কালে নিজের ঘরে ও ঘরের দরজায় ( মোছলেম ) প্রকাশ্যভাবে জীব-জন্তুর চিত্র অঙ্কিত পর্দ্দা ব্যবহার করিতেন। উপরে কাছেম-বেন-মোহাম্মদের একটি রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইনিও নিজে জীব-জন্তুর চিত্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। *

ফেরেশতাগণকে লইয়া এখানে আমাদিগকে আর একটা গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। জীব-জন্তুর ছবি ঘরে থাকিলেই যদি ফেরেশতাদের সেখানে একদম প্রবেশ-নিষেধ হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লার সৃষ্টি যে অচল হইয়া যাইবে! কারণ, জমিন ও আছমানের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সমস্তই ফেরেশতাদিগের কাজ। ফেরেশতারাই দিন-রাত মানুষের হেফাজত করিতেছেন, ফেরেশতারাই

* এ-সমস্ত নজির পরে উদ্ধৃত হইবে।

বনি-আদমের দুই কাঁধের উপর ছওয়ার হইয়া তাহাদের নেকী-বদীর জমা-খরচ লিখিতেছেন। ছবির ত্রিসীমায় প্রবেশ করা যখন ফেরেশতা-দিগের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, তখন, দুষ্টলোকেরা ইচ্ছা করিলে, কতকগুলি ছবি প্রস্তুত করিয়া লইয়া এই সব কারখানাকে একেবারে দরহম-বরহম করিয়া দিতে পারে। সব চাইতে বড় কথা এই যে, তাহা হইলে ছবিদ্বারা আজরাইল ফেরেশতার প্রবেশে নিষেধ ঘটাইয়া বনি-আদম একেবারে অমর হইয়া যাইতে পারে !

এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদের টীকাকারেরা লিখিতেছেন,—এখানে ফেরেশতা অর্থে সব ফেরেশতা নয়, একশ্রেণীর ফেরেশতা। ছবি থাকিলে রহমত ও বরকতের ফেরেশতারা গৃহে প্রবেশ করেন না— আর সব ফেরেশতার ইহাতে কোন বাধা হয় না ! কিন্তু, কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা যে এই প্রভেদ ও পার্থক্য কল্পনা করিয়া লইলেন, কেহই তাহার কোন আভাস প্রদান করেন নাই। রেওয়ায়তের বেখাপ কথাগুলিকে খাপ খাওয়াইবার জন্যই তাঁহারা এই প্রকারের একটা সমাধান কল্পনা করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু, আমাদের বক্তব্য এই যে, কথাটা আগাগোড়াই বেখাপ, হজরত রছুলে করিমের পক্ষে ঐরূপ একটা বেখাপ উক্তি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আল্লার ফেরেশতারা, বিশেষতঃ হজরত জিব্রাইল, ছবি থাকিলে সে গৃহে প্রবেশ করেন না, উপরোক্ত রেওয়ায়তগুলিতে নানা সূত্রে এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু, হাদিছের কেতাবে আমরা ইহাও দেখিতেছি যে—

عن عايشة ان جبريل جاء بصورتها فى خرقة حرير خضراء الى رسول الله صلعم -

স্বয়ং হজরত জিব্রাইল, বিবি আএশার একখানা ছবি সবুজ রেশমের কাপড়ে জড়াইয়া হজরত রছুলে করিমের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। ( তিরমিজী, মেশকাত مناقب ازواج النبى ৫৭৩ পৃষ্ঠা )। সুতরাং হজরত জিব্রাইলের যে ছবির প্রতি আদৌ কোন বিদ্বেষ নাই, এই রেওয়ায়ত হইতে তাহা স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে। পাঠকগণ উপরে দেখিয়াছেন এবং পরে আরও দেখিবেন যে, ছবি সংক্রান্ত ঐ উক্তিটী সত্য হইলে, হজরত ছোলায়মান নবীর এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার বাটীর ত্রিসীমায় পদার্পণ করাও ফেরেশতাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। পয়সায়, টাকায়, আনি দুআনি সিকি ও আধুলিতে, নোটে ও আশরফিতে, নাছারা বাদশাহ্‌র ছবি অঙ্কিত, এমন কি তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মিত থাকে। আমাদের হাদী ও পীর মুর্শিদ ছাহেবগণ ওয়াজের মজলিছে ও আল্লার মছজিদে বসিয়াও মুরিদানের নিকট হইতে সেগুলি অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়া থাকেন, আনন্দের সহিত সেগুলিকে জুব্বার জেবে রক্ষা করেন এবং সেই ছবি ও মূর্ত্তিগুলি সঙ্গে রাখিয়া মেম্বর ও মেহরাবের শোভাবর্দ্ধন করিয়া শত শত মুছলমানের এমামতও করেন। জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করিলে মানুষ যে কাফের মোশরেক হইয়া যায় এবং রহমত ও বরকতের ফেরেশতারা যে ঐ ছবির ত্রিসীমায় উপস্থিত হইতে পারেন না—এ-কথাগুলি তখন তাঁহাদের স্মরণ থাকে না কেন? রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জকে কি তাঁহারা সজীব পদার্থ বলিয়া মনে করেন না—না, খৃষ্টান-রাজার ছবি ও মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন বিশেষ বর্জ্জিত বিধি তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে?

বিবি আএশার পর্দ্দা সংক্রান্ত হাদিছের আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটী কথা বিশেষভাবে বিচার করা আবশ্যক। আবু-তালহা আনছারী, হজরত রছুলে করিমের একজন বিশিষ্ট ছাহাবী, জএদ-বেন-খালেদ জুহানীও

একজন ছাহাবী। অথচ এই জএদ আবু-তালহার মারফতে হজরতের একটী হাদিছের কথা শুনিতেছেন, সে-সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন এবং সেই তদন্ত করার জন্য বিবি আএশার নিকট উপস্থিত হইতেছেন। ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, হজরতের এন্তেকালের পর এই হাদিছটী আবু-তালহার নামকরণে প্রচলিত হইয়াছিল। জএদ স্বয়ং আবু-তালহার মুখে প্রত্যক্ষভাবে এই হাদিছটী শ্রবণ করিয়া থাকিলে তাঁহারই কাছে এই বিষয় তদন্ত করিতেন। হাদিছের عنعنة হইতেও এই সন্দেহের কতকটা সমর্থন হইয়া যায়। হজরতের একজন বিশিষ্ট ছাহাবীর মুখে এরূপ একটা রেওয়ায়ত শ্রবণ করিয়া থাকিলে সেই মুহূর্ত্তে বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। জএদ এ-সব কিছু না করিয়া বিবি আএশার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন—তিনি হজরতকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়াছেন কি না? বিবি আএশা অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন—তিনি হজরতকে ঐরূপ কথা বলিতে শুনেন নাই। এইটুকু বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতেছেন না, বরং চিত্রাঙ্কিত পর্দ্দাসংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া দিতেছেন।

একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, তছবির ব্যবহারের নিষেধ বা অনুমতি সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত রেওয়ায়তের ভিত্তি হইতেছে, বিবি আএশার ঐ চিত্রাঙ্কিত পর্দ্দাসংক্রান্ত ঘটনার উপর। এই উপলক্ষে হজরত কি বলিয়াছিলেন বা করিয়াছিলেন, বিবি আএশাই তাহার প্রধান, বরং একমাত্র সাক্ষী। জএদ নিজে ছাহাবী হইলেও, হজরতের সময় এইপ্রকার নিষেধাজ্ঞা তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। অন্যথায় একটা বিদিত বিষয়ের তদন্তের জন্য তাঁহার মনে আদৌ কোন আগ্রহের সৃষ্টি হইত না। কিন্তু, তাহার পর আবু-তালহার মুখে বা তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় তিনি যখন তছবির ও ফেরেশতা সংক্রান্ত এই

অশ্রুতপূর্ব্ব রেওয়ায়তটী শুনিতে পাইলেন, তখন উহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। অতএব, সমস্ত রেওয়ায়তের মূল যেখানে, সেই বিবি আএশার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি নিজের সন্দেহ নিবারণ করার চেষ্টা পাইলেন এবং তাঁহার মুখে জানিতে পারিলেন যে, ঐ সব বর্ণনার মূলে কোন সত্য নাই। চিত্রাঙ্কিত পর্দ্দা কাটিয়া যে গদী প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের বাড়ীতেই ছিল এবং হজরত রছুলে করিম নিজে সেগুলি ব্যবহারও করিতেন।

( ৬ )

## ( ৩ ) পুতুল ব্যবহার

বোখারী, আবু-দাউদ প্রভৃতির বিভিন্ন হাদিছে জানা যায় যে, মোছলেম-কুল-জননী বিবি আএশা, স্বামী-গৃহে সখীদিগের সহিত পুতুল লইয়া খেলা করিতেন। আমাদের এমাম, আলেম ও মোহাদ্দেছগণ সকলে একবাক্যে বলিতেছেন যে, জীব-জন্তুর পুতুল-প্রতিমূর্ত্তির খেলনা ব্যবহার করাতে কোনই দোষ নাই। কারণ, হজরতের হাদিছ হইতে তাহার অনুমতি পাওয়া যাইতেছে। ( দেখ—নববী ও ফৎহুল্‌বারী—তছবীর )। বিষয়টী পরিষ্কার করার জন্য নিম্নে এ-সংক্রান্ত আর একটা হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

عن عائشة قالت قدم رسول الله صلعم من غزوة تبرک او خيبر و فى سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعايشة لعب - فقال ما هذا يا عايشة ؟ قالت بناتى - و رأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع - فقال ما هذا الذى ارى وسطهن - قالت فرس - وقال وما هذا الذى عليه ؟ قلت

جناحان - قال فرس له جناحان ! قالت اما سمعت ان لسليمان خيلا لها اجنحة - قالت فضحك رسول الله صلعم حتى أيت نواجذه -

বিবি আএশা বলিতেছেন, হজরত রছুলে করিম তাবুক—অথবা, খায়বর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ছোট কামরার উপর একটা পর্দ্দা ছিল। এই সময় বাতাসে পর্দ্দার এক পাশ উড়িয়া যাওয়ায়, তাঁহার খেলনাগুলি হজরতের নজরে পড়িল। তাহাতে হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন—আএশা, এগুলি কি? আএশা উত্তর করিলেন—আমার খেলনা। খেলনাগুলির মধ্যে একটা ডানাওয়ালা ঘোড়ার উপর হজরতের নজর পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—মাঝখানে ওটা কি? আএশা বলিলেন—ঘোড়া। হজরত বলিলেন—ওর উপর ওগুলি আবার কি দেখা যাইতেছে? আএশা বলিলেন—ও দুটী ডানা। হজরত বলিলেন —ঘোড়ার আবার ডানা! আএশা বলিলেন—আপনি শুনেন নাই— ছোলায়মানের ঘোড়ার দুইখানা ডানা ছিল! বিবি আএশা বলিতেছেন —আমার কথা শুনিয়া হজরত এত হাসিলেন যে, আমি তাঁহার মাঢ়ির দাঁত দেখিতে পাইলাম ( আহমদ, আবুদাউদ—আদব )।

এই হাদিছ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অতিশয় স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে :—

( ১ ) হজরতের গৃহে জীব-জন্তুর পুতুল রক্ষিত হইত,

( ২ ) তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিবি আএশা তাহা ব্যবহার করিতেন,

( ৩ ) হজরতের তাহা জানা ছিল, তত্রাচ তিনি নিষেধ করেন নাই, বরং খেলাধূলার উপকরণ বলিয়া বিবি আএশার কথায় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন,

( ৪ ) হজরত মৌন থাকিয়া এই কার্য্যে সম্মতিই দিয়াছেন। মোহাদ্দেছগণের পরিভাষায় ইহা তক্‌রিরী হাদিছ,

( ৫ ) এই ঘরে প্রবেশ করিতে কোন ফেরেশতাকে কখনও কোন আপত্তি করিতে শুনা যায় নাই। অথচ, ছবির তুলনায় পুতুল অধিক আপত্তিজনক।

টীকাকারগণ বলিতেছেন—জীব-জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি খেলনা হিসাবে ব্যবহার করাতে কোন দোষ নাই। কারণ, হজরতের হাদিছদ্বারা তাহার অনুমতি পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু, ছবি আঁকা, মূর্ত্তি গড়া এবং সেগুলিকে ঘরে রাখা বা অন্য প্রকারে ব্যবহার করা সম্বন্ধে এতগুলি কঠোর আদেশ প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে, হজরত আবার এই পুতুলগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিলেন—কেন ও কোন্ নীতি অনুসারে, তাহাই হইতেছে এখানকার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সে কারণের কথা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব। পাঠকগণকে এখানে একটু জানাইয়া রাখিতেছি যে, হজরত রছুলে করিমের এই আদেশ-নিষেধগুলি একই সুগভীর ও স্বাভাবিক ওছুলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহার মধ্যে কোনই অসামঞ্জস্য নাই। জান্‌দারের ছবি, আর বেজানের ছবি বলিয়া হজরত রছুলে করিমের কোন বিদ্বেষ বা পক্ষপাত ছিল না—অথবা, ছবিই তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল না। যে শিক্ষা ও সাধনাকে দুনয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়ার জন্যই তাঁহার আগমন, তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে যে বস্তু তাহাই হারাম।—ইহাতে ছবি বা অ-ছবি বলিয়া কোন প্রভেদ নাই, জান্‌দার ও বেজান বলিয়া কোন পার্থক্য নাই। আর যে বস্তুগুলি তাহাতে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে না, বরং পক্ষান্তরে মানুষ তাহাদ্বারা কোন আনন্দ বা উপকার লাভ করিতে পারে, তাহা নির্দ্দোষ হালাল। ইহাই হইতেছে, এ-সকল মছলার ওছুল বা মূলনীতি। এই নীতিরই

অনুসরণ করিয়া এছলামে কতকগুলি ছবিকে হারাম ও কতকগুলিকে হালাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

এই নীতির প্রতি লক্ষ্য না রাখার ফলে, কোন কোন আলেম ছবি সংক্রান্ত হাদিছগুলিকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাহার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই পরস্পর-বিরোধী হাদিছগুলির অসমঞ্জস সিদ্ধান্ত দুইটীর মধ্যে, একটীকে অন্যের দ্বারা বারিত বা মনছুখ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাঁহারা ছবি না-জাএজ হওয়ার পক্ষপাতী—তাই বলিতেছেন যে, যে সকল হাদিছের দ্বারা ছবি বা পুতুল ব্যবহারের অনুমতি সূচিত হইতেছে, তাহা এছলামের প্রাথমিক্ষ যুগের ব্যবস্থা। নিষেধাত্মক হাদিছগুলির দ্বারা পরবর্ত্তী সময়ে ঐ ব্যবস্থাকে রহিত বা মনছুখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, ইহা তাঁহাদের খেয়াল ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা ভিত্তিহীন দাবী ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন হাদিছকে মনছুখ বলিয়া দাবী করিতে হইলে, যে সকল অকাট্য যুক্তি প্রমাণের আবশ্যক হইয়া থাকে, মোহাদ্দেছগণ তাহা খুব পরিষ্কারভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। মনছুখ-বাদীরা তাহার মধ্যকার কোন একটী যুক্তি-প্রমাণ ও উপস্থিত করিতে পারেন নাই। প্রাসঙ্গিক হিসাবে এখানে একটা সাধারণ যুক্তির উল্লেখ করিতেছি।

মোহাদ্দেছগণ বলিতেছেন—অমুক হাদিছটী অমুক হাদিছের দ্বারা রহিত বা মনছুখ হইয়াছে, ইহা বলিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে, যেটাকে মনছুখ বলা হইতেছে, বস্তুতঃ সেটা পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের হাদিছ এবং যে হাদিছের দ্বারা তাহাকে রহিত করা হইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী সময়ে বর্ণিত। ১৩ হিজরীর হাদিছদ্বারা ৩ হিজরীর হাদিছ রহিত হইতে পারে, কিন্তু,

৩ হিজরীর হাদিছদ্বারা ১৩ হিজরীর হাদিছ রহিত হইতে পারে না। সুতরাং রহিতের কথা আনিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে উভয় আদেশের সময় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অন্যথায়, তাঁহারা যেমন বলিতেছেন যে, নিষেধাত্মক হাদিছগুলিদ্বারা অনুমতি-সূচক হাদিছগুলি রহিত হইয়া গিয়াছে—অন্যপক্ষও সেইরূপ বলিতে পারেন যে, অনুমতি-সূচক হাদিছ-গুলিদ্বারা নিষেধাত্মক হাদিছগুলি রহিত হইয়া গিয়াছে। এ-পক্ষের দাবীকে তাঁহারা বাতিল করিবেন, কোন্ যুক্তির বলে? অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, এই সময়-নির্দ্ধারণের প্রমাণভারও মনছুখ-বাদীদিগের উপর ন্যস্ত আছে। কিন্তু, এইপ্রকার কোন প্রমাণ তাঁহারা কুত্রাপি প্রদান করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের এই দাবীটা সরাসরিভাবে ডিসমিসের যোগ্য।

মনছুখ-বাদীদিগের এই দাবী শুধু প্রমাণহীনই নহে, বরং স্পষ্ট প্রমাণের বিপরীত। পাঠকগণ দেখিতেছেন—আলোচ্য হাদিছটী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে, বিবি আএশার পুতুল ও পর্দ্দা সংক্রান্ত ঘটনা তাবুক অভিযানের—অন্ততঃ খায়বর যুদ্ধের—পরে সংঘটিত হইয়াছিল। বিবি আএশা নিজেই এই ঘটনার সাক্ষী ও রাবী। কিন্তু, তিনি তাবুকের কথা বলিয়াছিলেন, কি খায়বরের কথা বলিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী রাবীর তাহাতে সন্দেহ আছে। তবে, এই দুইটার মধ্যে একটার কথাই যে বিবি আএশা বলিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন। অধিকন্তু রাবী প্রথমে তাবুকের ও পরে খায়বারের উল্লেখ করিয়াছেন। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে تقديم তকদিম দ্বারা تعظيم তা'জিম সূচিত হয়, অর্থাৎ—"প্রথমোল্লেখ দ্বারা সে বিষয়ের গুরুত্ব প্রতিপাদিত হয়।" সুতরাং তাবুক হওয়াই যে অধিক সম্ভব, রাবীর বর্ণনা হইতেই তাহা জানা যাইতেছে। সে যাহা হউক, সর্ব্ববাদী-সম্মতরূপে, হজরত

রছুলে করিম তাবুক অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন—নবম হিজরীতে, আর খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল সপ্তম হিজরীর প্রথমভাগে। অর্থাৎ বিবি আএশার গৃহে এই পুতুলের ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, হজরত রছুলে করিমের ২৩ বৎসর নবীজীবনের ২২শ সনে, খায়বারের হিসাব ধরিলে ২০শ সনে। সুতরাং অনুমতি যে প্রাথমিক যুগের অবস্থা কখনই নহে, বিবি আএশারই স্পষ্ট সাক্ষ্য হইতে তাহা নিঃসন্দেহভাবে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

আরবদিগের তৎকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ক্রমে ক্রমে তাহাদের সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। এজন্য বাহিরের কোন কোন বিষয়কে সাময়িকভাবে নিষেধ করা হইয়াছিল, আবার যথাসময় সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করাও হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, ঠিক এই কারণে, কতকগুলি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা বিলম্বে বা পর্য্যায়ক্রমে প্রচার করা হইয়াছিল। শরিয়তের বিধি-ব্যবস্থার রদ-বদল বা নাছেখ-মনছুখ ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। এছলামের মৌলিক শিক্ষা এবং তাহার লক্ষ্য ও আদর্শের এক বিন্দুবিসর্গেরও পরিবর্ত্তন কোন দিনই হয় নাই, হইতেও পারে না। তাই পরমহিতৈষী পিতৃব্যের কাতর-অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া, নবীজীবনের প্রারম্ভেই হজরত রছুলে করিম জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"তাত! তাহারা যদি আমার এক হাতে চাঁদ ও অন্য হাতে সূর্য্য আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও কোফরের সহিত তাওহীদের সন্ধি কখনই হইতে পারে না।" আমাদের দেশের যে-সব আলেম ও সম্পাদক-মাওলানা, সকল প্রকারের ছবি ও পুতুল ব্যবহারকে সর্ব্বতোভাবে হারাম ও "ছাফ বোৎ-পরস্তীর প্রশ্রয়" বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—তাহা হইলে তাওহীদের প্রধানতম প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদ

মোস্তফা কি তাঁহার ২৩ বৎসর নবীজীবনের ২২ বৎসর পর্য্যন্ত—অন্ততঃ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত—সেই পৌত্তলিকতার ও "ছাফ বোৎ-পরস্তীর প্রশ্রয়" দিয়া গিয়াছেন? তাঁহাদের উক্তি সত্য হইলে, এই প্রশ্নের উত্তর যে কিরূপ সাংঘাতিক হইবে, তাঁহারা এখন একবার তাহা ভাবিয়া দেখিলে বাধিত হইব।

## জিব্রাইলের অনুমতি

আবুদাউদ, নাছাঈ ও তিরমিজি হইতে এই মর্ম্মের একটী হাদিছ উদ্ধৃত করা হয় যে—কোন ঘরে তছবির থাকিলে ফেরেশতাগণ তাহাতে প্রবেশ করেন না। ইহাকে স্বয়ং হজরত জিব্রাইলের উক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই হাদিছকে প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার করার সময় বলা হইয়া থাকে—"যেহেতু তছবির থাকিলে ফেরেশতাগণ সেখানে প্রবেশ করেন না, অতএব, তছবির রাখা হারাম।" এই হাদিছের একদিকের বিচার পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এখানে তাহার অন্য আর একদিক সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাহার পর এই হাদিছ হইতেই দেখাইব যে, স্বয়ং হজরত জিব্রাইল, ব্যবহারের প্রকার ভেদে, জীব-জন্তুর অ-বিকৃত ছবি ব্যবহার করার স্পষ্ট অনুমতি প্রদান করিয়াছেন!

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, ঘরে ছবি থাকিলে যেমন সেখানে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না, সেইরূপ আরও দুইটী বস্তু আছে, যাহার জন্যও ফেরেশতারা সেখানে উপস্থিত হইতে পারেন না—সেই বস্তু দুইটীর কথাও ঐ সব হাদিছে তছবিরের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটী হইতেছে—কুকুর। আলোচ্য হাদিছে সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইতেছে যে, কুকুর থাকিলেও ফেরেশতাগণ সেখানে প্রবেশ করেন না। সুতরাং হাদিছটীর প্রচলিত তাৎপর্য্য ঠিক হইলে,

তুনয়ার অধিকাংশ স্থলেই ফেরেশতাদিগের একদম "প্রবেশ নিষেধ" হইয়া যাইবে! পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি—কোর্‌আন কুকুর পুষিবার, তাহাকে শিক্ষা দিবার ও তাহার মারা শিকার খাইবার অনুমতি দিতেছে ( মায়দা—৪র্থ আয়ত )। সংসারের বিভিন্ন কাজের জন্য কুকুর পুষিবার অনুমতি বহু সংখ্যক হাদিছ হইতেও প্রমাণিত হইতেছে। আমাদের এমাম ও আলেমগণ এ-বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু, "ঘরে ছবি থাকিলে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না"—বলিয়া যদি ছবি আঁকা ও রাখা হারাম হইয়া যায়, তাহা হইলে এই "যুক্তি" অনুসারে কুকুর পোষা ও রাখাও হারাম হইয়া যাইবে।

বিপদ এখানেই শেষ হইতেছে না। আবুদাউদ ও নাছাঈ প্রভৃতিতে এই হাদিছে, তছবির ও কুকুরের সঙ্গে সঙ্গে আরও বলা হইতেছে—

... ولا جنب

অর্থাৎ ঘরে তছবির, কুকুর ও 'জোনোব' থাকিলে ফেরেশতাগণ তাহাতে প্রবেশ করেন না। সঙ্গমের পর ও স্নান না করা পর্য্যন্ত নর-নারীর যে অশুচি-অবস্থা, তাহাকে 'জানাবৎ' বলা হয়। যাহার জনাবৎ হয়, সে জোনোব। এখন পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন,—"ঘরে ছবি থাকিলে ফেরেশতারা সেখানে প্রবেশ করেন না"—এই অজুহাতে ছবি বানান যদি হারাম হইয়া যায়, তাহা হইলে স্বামী-স্ত্রীর মিলনও নিশ্চয় হারাম হইয়া যাইবে, কারণ অশুচির সৃষ্টি হয় তাহাদের এই মিলনদ্বারা। আর ঐ যুক্তি বলে ঘরে ছবি রাখা যদি হারাম হইয়া যায়, তাহা হইলে এই হাদিছও এই যুক্তি বলে এবং এই ফেরেশতাতত্ত্বের ফলে, বিবাহিত জীবন-যাপন করা মানুষের পক্ষে নিশ্চয়ই ঘোর বিপদজনক হইয়া দাঁড়াইবে।

কোন কোন টীকাকার বলিয়াছেন—হাদিছে এই তিন বিষয়ের

উল্লেখ এক সঙ্গে ও সাধারণভাবে করা হইয়াছে—সত্য। কিন্তু, বস্তুতঃ এখানে 'জোনোব' বলিতে কেবল সেই অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বুঝাইতেছে—যাহারা সাধারণতঃ "স্নান" পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত। আর কুকুর বলিতে এখানে কেবল সেই সব কুকুরকে বুঝাইতেছে—যেগুলি লোকে অনর্থক খেলা-তামাশার জন্য পুষিয়া থাকে। কিন্তু, বাড়ী-ঘর, ক্ষেত-খামার বা পশুপাল চৌকি দিবার, কিম্বা শিকারের, অথবা এইপ্রকারের অন্য কোন দরকারের জন্য যে-সব কুকুর পোষা হয়, তাহা এই নির্দ্ধারণ হইতে বর্জ্জিত (আওনুল-মাবুদ ৪—১২১)। কিন্তু, ছবির বেলায় এই যুক্তি-ধারা সমানভাবে প্রয়োগ করিতে তাঁহাদের কেহ কেহ কুণ্ঠিত। সংস্কারের সম্মান রক্ষা ব্যতীত এই কুণ্ঠার অন্য কারণ তাঁহাদের নাই। অবশ্য, বিশেষ বিশেষ প্রকারের ছবিকে অধিকাংশ এমাম ও আলেম নির্দ্দোষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। এখন হজরত জিব্রাইলের অনুমতির হাদিছটা নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি। আশা করি, ইহার পর আমাদের উদ্বেগের আর কোন কারণ থাকিবে না।

আলোচ্য হাদিছে বলা হইতেছে—হজরতের দরজার উপর একটী মূর্ত্তি ছিল এবং তাঁহার গৃহে জীব-জন্তুর চিত্র-সমন্বিত একটী পর্দ্দা লটকান ছিল। ইহাতে জিব্রাইল হজরতের গৃহে প্রবেশ না করিয়া ফিরিয়া যান এবং পরদিন আসিয়া এই ব্যাপারটা বিবৃত করিয়া বলেন ঃ

فمر برأس التمثال الذى على باب البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة - و مر بالستر فليقطع فليجعل و سادتين منبوذتين توطأن - ( الى قوله ) - ففعل رسول الله صلعم -

"দরওয়াজার উপরে যে মূর্ত্তিটী আছে, তাহার মাথাটা কাটিয়া দিতে

আদেশ করুন—যেন গাছের মত তাহার আকার হইয়া যায়। আর পর্দ্দাটী সম্বন্ধে আদেশ করুন, কাটিয়া ফেলা হউক এবং তাহাদ্বারা দুইটা গদি নির্ম্মাণ করা হউক, সেই গদি বিছান থাকিবে ও পদদলিত হইবে। অতঃপর, হজরত এইরূপ করিলেন (আবুদাউদ, নাছাঈ, তিরমিজী)। পর্দ্দার ছবিগুলি সম্বন্ধে নাছাঈর রেওয়ায়তে বলা হইতেছে--

اما ان تقطع رؤسها او يجعل بساطا يوطأ -

"হয় উহার ছবিগুলির মাথা কাটিয়া ফেলা হউক, অথবা, তাহাকে বিছানারূপে ব্যবহার করা হউক, যেমতে তাহা পদদলিত হইতে থাকে।" সমস্ত রেওয়ায়ত একবাক্যে বলিতেছে যে, পর্দ্দাখানা দ্বারা গদি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। জিব্রাইলের আদেশ ছিল দুইটী, অর্থাৎ এই দুইটীর মধ্যে যে কোন একটাই হজরতের করণীয় ছিল। সুতরাং পর্দ্দাদ্বারা যখন শয্যা নির্ম্মাণ করা হইল, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মাথা কাটিয়া তাহার আকার পরিবর্ত্তন করার আদেশ নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ছবিগুলি বিকৃত না করিয়া, পর্দ্দাটাকে বিছানায় পরিণত করিয়া লইলে, তাঁহার আপত্তির আর কোন কারণ ছিল না, তাহা তিনিই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। হজরত রছুলে করিম এই বিছানা বা গদি বরাবরই ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এই হাদিছগুলি হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যাইতেছে যে, সকল প্রকার ছবি সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করেন নাই, বরং প্রকার ভেদ করিয়া ছবি ব্যবহারের অনুমতি তিনি দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গের উপসংহারে জানাইয়া রাখিতেছি যে, পূর্ব্ববর্ত্তী হাদিছগুলির রাবীদিগের ন্যায়, এই হাদিছের মূল রাবী হজরত আবু-হোরায়রাও নিজে জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করিতেন। এই সব নজিরের আলোচনা পরে একত্রে করা হইবে।

## ( ৫ ) বিবি আএশার স্পষ্ট সাক্ষ্য

উপরের দলিল-প্রমাণগুলির প্রতি অতিশয় অন্যায়ভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, অনেকে বলিয়া থাকেন—পর্দ্দাটা বিবি আএশা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হওয়ার ফলে, তাহার ছবিগুলি সমস্তই এমনভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাকে ছবি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না। এই দাবীর কোন প্রমাণ কেহই এ-যাবত উপস্থিত করিতে পারেন নাই। বরং উপরি বর্ণিত হাদিছগুলি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রতিবাদই হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, এখানে ক্ষান্ত না হইয়া, আমরা স্বয়ং বিবি আএশার একটা স্পষ্টতর সাক্ষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বিদেশ হইতে হজরত রছুলে করিমের ফিরিয়া আসার এবং পর্দ্দা সম্বন্ধে তাঁহার অসন্তোষ প্রকাশ করার বিবরণ দেওয়ার পর, বিবি আএশা বলিতেছেন :

فقطعته مرفقتين فقد رأيته متكئا على احداهما و فيها صورة -

'অতঃপর, আমি তাহা কাটিয়া দুইটী গদি ( গাও তকৃয়া ) বানাইলাম। অতঃপর হজরতকে তাহার একটার উপর ঠেস দিয়া বসিতে দেখিলাম— **অথচ, তাহাতে ছবি বা তছবির বিদ্যমান ছিল** ( মোছনাদে আহমদ, ৬ খণ্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা )।"

এই হাদিছ হইতে স্পষ্টতরভাবে ও অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে যে, গদি বানাইবার পরও তাহাতে "ছুরৎ" বা ছবি বিদ্যমান ছিল এবং হজরত রছুলে করিম স্বয়ং সেই ছবিযুক্ত গদি ব্যবহার করিতেন।

## ( ৬ ) আবু-তালহার হাদিছ

আবু-তালহা আন্‌ছারী হজরতের একজন বিশিষ্ট ছাহাবী। বোখারী

ও মোছলেমের বরাৎ দিয়া পরবর্ত্তী হাদিছগ্রন্থগুলিতে একটা রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়া থাকে। ঐ রেওয়ায়তে সঙ্ক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, কোন গৃহে তছবির থাকিলে, ফেরেশতাগণ তাহাতে প্রবেশ করেন না, (মেশকাৎ প্রভৃতি)। উপরে তাঁহার পরবর্ত্তী রাবীদিগের প্রমুখাৎ সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে. الا رقما فى ثوب অর্থাৎ "কিন্তু যদি ছবি বস্ত্রে অঙ্কিত বা মুদ্রিত থাকে, তাহাতে কোন দোষ নাই"—এই অংশটাও ঐ হাদিছের শেষভাগে সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু, এই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তৃতীয় পর্য্যায়ের রাবীদিগের মুখে। হজরতের মুখে শুনিয়াছেন আবু-তালহা, তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন জএদ-এবনে-খালেদ এবং জএদের মুখে শুনিয়াছেন ওবায়দুল্লাহ্। এই ওবায়দুল্লাহ্ ঐ অংশটার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, ওবায়দুল্লার সঙ্গী বোছর-এবনে-ছঈদ খালেদের বর্ণনার এই অংশটা শুনিতে পান নাই। মহাদ্দেছগণের নির্দ্ধারিত বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে এরূপ হাদিছ চরম প্রমাণ বলিয়া গণ্য। কিন্তু, এই বিধি-ব্যবস্থার দোহাই দিয়া ক্ষান্ত হওয়া, আমি সঙ্গত মনে করিতেছি না। কারণ, ইহা উপলক্ষ করিয়া সাধারণ পাঠকবর্গকে প্রবঞ্চিত করার চেষ্টা হইতে পারে। তাই তিরমিজী ও নাছাঈর একটা হাদিছ নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি। পাঠকগণ উহা হইতে স্বয়ং আবু-তালহা আনছারীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি জানিতে পারিবেন।

ওবায়দুল্লাহ্-এবনে-আবদুল্লাহ্ বলিতেছেন, আবু-তালহা আনছারী পীড়িত হওয়াতে; আমি তাঁহার বেমার-পুর্সি করিতে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, ছহল-এবনে-হোনাএফ আবু-তালহার কাছে বসিয়া আছেন। অতঃপর, আবু-তালহা জনৈক লোককে তাঁহার তলস্থ শয্যাটা টানিয়া লইতে আদেশ করিলেন। ইহাতে ছহল তাঁহাকে বলিলেন—ওটা বাহির করিতেছেন কেন? আবু-তালহা বলিলেন—উহাতে কতকগুলি

তছবির আছে, সেইজন্য—আর তছবির সম্বন্ধে হজরত যাহা বলিয়াছেন, আপনি তাহা অবগত আছেন। তখন ছহল বলিলেন:

الم يقل الا ما كان رقما فی ثوب ؟ قال بلى - ولكنه اطيب لنفسى -

হজরত রছুলে করিম "কিন্তু যাহা বস্ত্রে অঙ্কিত থাকে"—একথাও কি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেন নাই? আবু-তালহা উত্তর করিলেন—"হাঁ, বলিয়াছেন। তবে, আমার অন্তরে ইহাই ভাল লাগে।"

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, এই ছহল-এবনে-হেনাএফও একজন বিখ্যাত 'বদরী' ছাহাবী, হজরত আলীর খেলাফৎকালে ইঁহাকে বছরার গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল (তকরিব)। এই হাদিছ হইতে প্রথমতঃ আবু-তালহার স্বীকারোক্তি প্রমাণিত হইতেছে। তাহার পর হাদিছের ঐ অংশটীও যে, হজরত রছুলে করিমের উক্তি, আর একজন বিখ্যাত ছাহাবীর মুখেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, স্বয়ং হজরত আবু-তালহা আনছারীও জীব-জন্তুর চিত্র অঙ্কিত শয্যা ব্যবহার করিতেন, তাহাও এই হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে। তিনি হজরতের ছাহাবী এবং স্বয়ং এই হাদিছের রাবী। ঐ শ্রেণীর ছবি ব্যবহার করা হারাম হইলে, অথবা (আমাদের কতিপয় সম্পাদক-মাওলানার পরিভাষা অনুসারে) উহা "শেরেক ও ছাফ বোৎপরস্তি" হইলে, তিনি উহা কস্মিনকালেও ব্যবহার করিতেন না। আমাদের এই শ্রেণীর মাওলানা ছাহেবদের যেখানে সংস্কারে বাধে, সেখানে তাঁহারা পরহেজগারীর দাম্ভিকতায় হজরতের ছাহাবাগণকে, এমন কি স্বয়ং হজরতকেও, অতিক্রম করিয়া যাইতে চান,—সব চাইতে বড় বিপদ হইয়াছে ইহাই।

## ( ৭ )

## ( ৭ ) ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের নজির

ছাহাবা ও তাবেয়ীদিগের তছবির ব্যবহারের যে কয়েকটা নজির আমি ইতিমধ্যে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পুস্তকের বরাতসহ নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। উপযুক্ত ব্যক্তিগণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, এইপ্রকার আরও বহু নজির সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। উপরে অন্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার মধ্যকার কয়েকটা নজিরের উল্লেখ করা হইয়াছে। খায়রুল-কোরূন্ বা শ্রেষ্ঠতম যুগের নজিরগুলি একত্র সঙ্কলন করিয়া দিলে, আলোচনার সুবিধা হইবে মনে করিয়া, নিম্নে সেগুলির পুনরুল্লেখ করিয়া দিলাম।—

### ১। বিবি আএশা।

বিবি আএশা ছিদ্দিকা হজরতের বাড়ীতে পুতুল ও জীব-জন্তুর চিত্রাঙ্কিত পর্দা ব্যবহার করিতেন। উপরের বরাতগুলি দ্রষ্টব্য।

### ২। আবু-তালহা।

হজরতের ছাহাবী আবুতালহা আনছারী জীব-জন্তুর চিত্রাঙ্কিত শয্যা ব্যবহার করিতেন ( নাছাঈ, তিরমিজী )।

### ৩। ছহল-এবনে-হোনাএফ।

ছাহাবী ছহল-এবনে-হোনাএফ বস্ত্রে অঙ্কিত জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করাকে জাএজ মনে করিতেন ( নাছাঈ, তিরমিজী )।

### ৪। জএদ-এবনে-খালেদ।

ছাহাবী জএদ-এবনে-খালেদ জুহনী জীব-জন্তুর চিত্রাঙ্কিত পর্দা ব্যবহার করিতেন ( বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ )।

**৫। এবনে-আব্বাছ।**

বিখ্যাত ছাহাবী আবদুল্লাহ-এবনে-আব্বাছ জীব-জন্তুর চিত্র-খোদিত আতশ-দান ব্যবহার করিতেন। একদা তাঁহার জনৈক বন্ধু ইহাতে আপত্তি করিলে, তিনি হজরতের আদেশের উদ্দেশ্য লইয়া আলোচনা করেন। অবশেষে, সেই লোকটী চলিয়া যাওয়ার পর (যে কোন কারণে হউক) তছবিরগুলির মাথা কাটিয়া দিতে আদেশ করেন (তায়ালিছি ৩৫৬ পৃষ্ঠা)।

**৬। আনছে-এবনে-মালেক।**

বিখ্যাত ছাহাবী আনছ-এবনে-মালেক যে আংটী ব্যবহার করিতেন, তাহার নগীনায় বাঘের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল (ওছোতুল-গাবা)।

**৭। আবু-হোরায়রা।**

৫৩৭৪টী হাদিছের রাবী, বিখ্যাত ছাহাবী আবু-হোরায়রা যে আংটী ব্যবহার করিতেন, তাহার নগীনাতে দুইটী মাছির ছবি অঙ্কিত ছিল (আইনী—হেদায়ার টীকা)।

**ওমর-ফারুক।**

হজরত ওমরের খেলাফৎকালে একটী আংটী পাওয়া যায়, লোকে তাহাকে হজরত দানয়াল নবীর আংটী বলিয়া মনে করিত। ঐ আংটীর নগীনায়, দুইদিকে দুইটী বাঘের ও তাহার মধ্যস্থলে একটী বালকের ছবি অঙ্কিত ছিল। জীব-জন্তুর ছবি আছে বলিয়া হজরত ওমর ঐ আংটীটী নষ্ট করিয়া ফেলেন নাই। বরং বিখ্যাত ছাহাবী আবু-মূছা আশআরীকে তাহা উপহারস্বরূপ দান করিয়াছিলেন (আইনী, ঐ)।

**৯। কাছেম-এবনে-মোহাম্মদ।**

কাছেম-এবনে-মোহাম্মদ হজরত আবু-বকরের পৌত্র এবং স্বনাম-

খ্যাত তাবেয়ী। যে সাত জন বিখ্যাত পণ্ডিতের সাধনার ফলে মদিনার 'ফেকাঃ' গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। হাফেজ-এবনে-হজর তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে, কাছেম-এবনে-মোহাম্মদ সে যুগের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদিগের একজন। মোহাদ্দেছ এবনে-আবিশায়বা ছহি ছনদ সহকারে রেওয়ায়ত করিতেছেন যে, তিনি কাপড়ের উপর অঙ্কিত বা মুদ্রিত জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করিতেন। ওনকা প্রভৃতি নানাপ্রকার পাখীর ছবি তাঁহার বাটীতে রক্ষিত হইত (ফৎহুলবারী ১০—৩০০)।

## ১০। ওরওয়া-এবনে-জোবাএর

ওরওয়া-এবনে-জোবাএর হজরত-আবুবকরের দৌহিত্র, এমামুল-মোহাদ্দেছিন বলিয়া খ্যাত। মদিনার উল্লিখিত পণ্ডিত সপ্তকের মধ্যে তিনিও একজন শ্রেষ্ঠ এমাম। "তিনি যে সব গদি ঠেস দিয়া বসিতেন, তাহাতে পাখীর ও মানুষের অনেক ছবি ছিল (ঐ)।" তাঁহার বোতামে মানুষের মুখের ছবি থাকিত (এবনে-ছাআদ— جزء تابعين مدينـــه ১৩৬ পৃষ্ঠা)।

উপরে যে সকল দলিল প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সকল শ্রেণীর চিত্র ব্যবহার করাকে এছলাম কোনদিনই হারাম বলিয়া নির্দ্ধারণ করে নাই। বরং হজরত রছুলে করিম স্বয়ং ও তাঁহার ছাহাবাগণ, জীব-জন্তুর চিত্রাঙ্কিত পর্দ্দা প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি—চিত্র বলিয়াই চিত্রকে হারাম করা হয় নাই, উহা হারাম হওয়ার অন্য কিছু গভীর ও সঙ্গত কারণ আছে। সেই কারণ যেখানে পাওয়া যাইবে, সেখানে জানদার ও বে-জান সকল শ্রেণীর চিত্রই হারাম হইবে। আর যেখানে সে কারণ

পাওয়া না যাইবে, সেখানে জীব-জন্তুর চিত্র ব্যবহার করাও সিদ্ধ বা জাএজ হইবে।

( ৮ )

ভারতবর্ষের আলেমগণ সাধারণভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, জীব-জন্তুর চিত্রের সকল প্রকার ব্যবহার সর্ব্বোতোভাবে নিষিদ্ধ। কোর্‌-আন-হাদিছের দলিল-প্রমাণের দিক দিয়া তাঁহাদের এই দাবীটী যে কতদূর অসঙ্গত, পূর্ব্বে তাহা যথেষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু, কেবল কোর্‌আন-হাদিছের দলিল-প্রমাণ দেখিয়া আজকালকার অনেক আলেম সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাই তাঁহাদের দ্বিধা দূর করার জন্য, বিভিন্ন মজহাবের বিখ্যাত এমাম, মোহাদ্দেছ ও টীকাকারগণের কএকটা অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহাতে পাঠকগণ প্রথমে দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবর্ষীয় আলেমগণের প্রচলিত অভিমত, তাঁহাদের মজহাবের এমামগণের অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্তগুলিরও সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার পর, কোন্ প্রকারের চিত্র কোন্ অবস্থায় এবং কি কারণে জাএজ বা হারাম হইবে, তাহারও একটা আভাষ তাঁহারা এই অভিমতগুলির মধ্যে দেখিতে পাইবেন।

## ( ৮ ) হানাফী মজহাবের সিদ্ধান্ত

( ১ ) হানাফী মজহাবের প্রধানতম মোহাদ্দেছ, এমাম আবু-হানিফার অন্যতম শিষ্য, **এমাম মোহাম্মদ,** উপরি-বর্ণিত আবু তালহার হাদিছটী উল্লেখ করার পর বলিতেছেন :

و بهذا ناخذ ما كان فيه من تصاوير من بساط يبسط او فراش يفرش اوْ وسادة فلا باس بذلـك - انما يكره من ذلـك فى الستر و ما ينصب نصبا - و هو قول ابى حنيفة و العامة من فقهائنا -

"আমারা এই হাদিছ অনুসারে আমল করি :—যে সকল ফরশ বিছান হইয়া থাকে তাহাতে, কিম্বা বালিশ ও 'তাকৃয়ায়' যে সব তছবির থাকে, তাহা ব্যবহার করায় দোষ নাই। কারণ, একমাত্র সেই ছবিগুলি ব্যবহার করা মকরূহ, যাহা পর্দ্দায় অঙ্কিত থাকে, অথবা, যাহা লটকাইয়া রাখা হয়। **ইহাই আবু-হানিফার এবং হানাফী-মজহাবের সর্ব্বসাধারণ ফকীহ্‌গণের অভিমত !** ( মোওয়াত্তা, ৩৮০ পৃষ্ঠা)।

উদ্ধৃত এবারতে "একমাত্র সেই ছবিগুলি ব্যবহার করা মকরূহ..." এই অংশের টীকায় স্বনাম-খ্যাত মাওলানা আবদুল-হাই ছাহেব লিখিতেছেন :

لما فيه من تعظيم الصورة -

"কারণ ইহার ( অর্থাৎ পর্দ্দায় থাকিলে বা লটকাইয়া রাখিলে) ছবির একপ্রকার সম্মান সূচিত হয়" ( তা'লিকুল-মোমাজ্জাদ )।

( ২ ) হানাফী মজহাবের বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এমাম **আবু-জা'ফর তাহাবী** شرح معانی الآثار পুস্তকে লিখিতেছেন :—

فثبت بما ذكرنا خروج الصور اللتى فى الثياب من الصور المنهى عنها و ثبت ان المنهى عنه هى نظير ما يفعله النصارى فى كنائيسهم من الصور فى جدرانها و من تعليق الثياب المصورة فيها - فاما ما كان يوطأ و يمتهن و يفترش فهو خارج من ذلك - و هذا مذهب ابى حنيفة و ابى يوسف و محمد رحمهم الله تعالى -

অর্থাৎ—আমরা উপরে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে ছবিগুলি কাপড়ে থাকে, সেগুলি নিষিদ্ধ ছবির

অন্তর্ভুক্ত নহে। উহাদ্বারা আরও সপ্রমাণ হইতেছে যে, কেবল সেইশ্রেণীর ছবিগুলি নিষিদ্ধ, খৃষ্টানদিগের গির্জ্জায় যাহার নজির পাওয়া যায়—তাহার দেওয়ালগুলিতে যেরূপ ছবি থাকে, অথবা, গির্জ্জায় তাহারা যেরূপ চিত্রাঙ্কিত বস্ত্র লটকাইয়া দিয়া থাকে। কিন্তু, যেসব চিত্র পদ-দলিত ও অসম্মানিত হয়, তাহা এই নিষেধ হইতে বর্জ্জিত। ইহাই **এমাম আবু-হানিফার,** (এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যদ্বয়) **কাজী আবু-ইউছুফ ও এমাম মোহাম্মদের মজহাব।** (২—৩৪)।

(৩) হানাফী মজহাবের স্বনাম-খ্যাত পণ্ডিত বোখারী ও হেদায়ার টীকাকার, আল্লামা **আয়নী,** বোখারীর টীকায় লিখিতেছেন :

و اغانهى الشارع اولا عن الصور كلها و أن كان رقما ' لانهم كانوا حديثى عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلـك جملـــة - ثـم لما تقرر نهيه عن ذلـك' اباح ما كان رقما فى ثياب للضرورة الى ايجاب الثياب - فاباح ما يمتهن ' لانه يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن و بقى النهى فيما لا يمتهن -

অর্থাৎ—হজরত রছুলে করিম প্রথমে সকল প্রকার চিত্র ব্যবহার—এমন কি, বস্ত্রে অঙ্কিত ছবিগুলিকেও—নিষিদ্ধ করিয়া দেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মুছলমান তছবিরের পূজা অল্পদিন মাত্র পরিত্যাগ করিয়াছিল। অতএব, হজরত তখন সকলপ্রকার চিত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু, যখন তাঁহার এই নিষেধাজ্ঞাটী প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তখন তিনি আবশ্যকতা অনুসারে বস্ত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলিকে জাএজ করিয়াছিলেন। অতঃপর, যেসব চিত্র অসম্মানিত হয়, তাহাকে তিনি জাএজ করিয়া দিলেন। কারণ, অসম্মানিত হয় যে সব চিত্র, মূর্খদের প্রতিও তাহার পূজার আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে,

যাহা অসম্মানিত না হয়, তাহার নিষেধাজ্ঞা পূর্ব্বের ন্যায় বলবৎ রহিল। ( মাআরেফ হইতে গৃহীত )।

( ৪ ) বিখ্যাত মোহাদ্দেছ, **ফকীহ আবুল্লএছ ছমরকন্দী,** "তছবিরের নিষেধাজ্ঞা" ( باب النهى عن التصاوير ) অধ্যায়ে কএকটা হাদিছ উদ্ধৃত করার পর বলিতেছেন :

و به نأخذ - فلا بأس بأن يبسط الثياب التى فيها التصاوير و التماثيل -

অর্থাৎ—এই হাদিছগুলিকে আমরা প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করি। অতএব, যেসব বস্ত্রে ছবি অঙ্কিত থাকে, তাহা বিছাইতে কোন দোষ নাই। ( বোস্তান, ঐ অধ্যায় )।

( ৫ ) ইহা ব্যতীত হেদায়া, ফতাওয়া আলমগিরী, রদ্দুল-মোহতার প্রভৃতি হানাফী মজহাবের ফেকার কেতাবগুলিতে উপরোক্ত মতবাদেরই প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে। তবে, এই সকল পুস্তকে উহার সঙ্গে যে, নূতন মছলাটী যোগ করা হইয়াছে, তাহা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই সকল পুস্তকের مفسدات صلوة অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুছল্লীর দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধদেশে ছাতের গায়, সম্মুখে বা পশ্চাতে কোন ছবি থাকিলে তাহার নামাজ মকরূহ হইয়া যাইবে। কিন্তু—

لا بأس بأن يصلى على بساط فيه تصاوير و لا يسجد على التصاوير -

"যে শয্যায় চিত্ররাজি অঙ্কিত, তাহার উপর নামাজ পড়াতে কোন দোষ নাই—যদি ছবির উপর ছেজদা না হয়।"

এমাম অবু-হানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণের এবং হানাফী মজহাবের বিখ্যাত আলেম ও গ্রন্থকারদিগের এই সকল অভিমত হইতে স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ হইতেছে যে, তাঁহাদের মতে—

(ক) জীব-জন্তুর ছবির সকল প্রকার ব্যবহার হারাম নহে। বরং কোন কোন অবস্থায় জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করা, এমন কি, চিত্রসম্বলিত বিছানার উপর নামাজ পড়াও তাঁহাদের মতে নির্দ্দোষ।

(খ) কোন্ ছবি নিষিদ্ধ, আর কোন্‌গুলি নির্দ্দোষ, তাহা স্থির করা হইবে ছবিগুলির ব্যবহার অনুসারে। যদি ব্যবহারের দ্বারা ছবিগুলি অসম্মানিত হয়, তবে তাহা নির্দ্দোষ, অন্যথায় নিষিদ্ধ।

(গ) এই হেতুবাদের কারণ এই যে, ছবি অসম্মানিত না হইলে তাহার পূজা হওয়ার অশঙ্কা থাকে। আর পূজা হওয়ার আশঙ্কা থাকে যেসব বস্তু সম্বন্ধে, তাহার ব্যবহার নিশ্চয়ই হারাম।

(খ) এবং (গ) দফা সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। এখানে প্রতিপাদ্য এই যে, হানাফী মজহাব অনুসারে জীব-জন্তুর ছবি রাখা ও ব্যবহার করা সর্ব্বাবস্থায় নিষিদ্ধ নহে। আমাদের দেশে হানাফী আলেমগণ ঐ প্রকার ফৎওয়া দিয়া, হানাফী মজহাবের এবং স্বয়ং এমাম আবু-হানিফা ছাহেবের স্পষ্ট সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।

## শাফেয়ী ও মালেকী মজহাবের অভিমত

শাফেয়ী মজহাবের আলেমগণের মধ্যে, বোখারীর টীকাকার **হাফেজ এবনে হজর** আস্কলানী এবং মোছলেমের টীকাকার **এমাম নবভীর** নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। নিম্নে তাঁহাদের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। হাফেজ এবনে হজর বোখারীর টীকায় বলিতেছেন :

واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور اذا كانت لها طل وهى مع ذلك مما يوطأ ويداس او يمتهن بالاستعمال

كالمخـــاد و الوسايد - قال النواوى و هو قول الثورى و مالك و ابى حنيفة و لا فرق فى ذلــك بين ما له ظل و ما لا ظل له فان كان معلقا على حائط او ملبوس او على عمامة او نحو ذلــك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام -

অর্থাৎ—এই হাদিছ হইতে প্রতিপন্ন করা হয় যে, যদি তছবির এরূপ হয় যে তাহার ছায়া পড়িতে পারে, অথচ, এতৎসত্ত্বেও তাহা পদদলিত হয়, অথবা, ব্যবহারের দ্বারা তাহার অসম্মান করা হয়—যেমন বালিশ ও গাওতাকৃয়ায়—তবে সেই সব ছবি বানান ও রাখা জাএজ হইবে। এমাম নববী বলেন—**ইহাই এমাম ছুওরী, মালেক, এমাম আবু-হানিফা ও এমাম শাফেয়ীর মত** এবং এ-সম্বন্ধে তছবিরের ছায়া থাকা না থাকা বলিয়া প্রভেদ কিছুই নাই। তবে, যদি দেয়ালে লটকান থাকে, কিম্বা, পোষাকরূপে পরিহিত হয়, অথবা, পাগড়ীতে ব্যবহার করা হয় – অথবা, এরূপভাবে ব্যবহার করা হয়, যাহা অসম্মানিত বলিয়া গণ্য হয় না, তবে, তাহা হারাম হইবে। (ফৎহুল-বারী ১০—৪২৬)।

## হাম্বলী মজহাবের অভিমত

مذهب الحنابلــة جواز الصورة فى الثوب ، و لو كان معلقا ، على ما فى خبر ابى طلحـــة - لكن ان ستـــر بـــه الجدار منــع عنـــهم -

অর্থাৎ—হাম্বলী মজহাব অনুসারে, কাপড়ে অঙ্কিত বা মুদ্রিত থাকে যে সব ছবি, তাহা ব্যবহার করা জাএজ। লটকান থাকিলেও জাএজ হইবে। কিন্তু, তাহাদ্বারা যদি দেয়াল ঢাকা হয়, তবে, তাহা হারাম। (ঐ)।

উপরের উদ্ধৃতাংশগুলি হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রচলিত চারি মজহাবের এমাম ও আলেমগণের মধ্যে কেহই জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করাকে সকল অবস্থায় হারাম বলেন নাই। বরং তাঁহাদের স্পষ্ট অভিমত এই যে, ব্যবহারের প্রকার-ভেদে একই ছবি কখন জাএজ, আর, কখন হারাম হইয়া যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ছবি বলিয়াই ছবিকে কেহ হারাম করেন নাই। এ-সম্বন্ধে সমস্ত মজহাবের এমাম ও আলেমগণ একমত। তবে, হারাম হওয়ার কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ এমামের মতে ছবিগুলির ব্যবহার যদি এরূপে করা হয়, যাহাতে সেগুলির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে তাহা জাএজ হইবে। কারণ, সে অবস্থায় ঐ ছবিগুলির পূজা হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে না। অতএব, তাঁহাদের যুক্তিবাদের সার এই দাঁড়াইতেছে যে, যদি কোন ছবির পূজা হওয়ার কোন প্রকার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই প্রকার ছবি ব্যবহার করা নিশ্চয় হারাম। বালিশ ও গাওতকৃয়ার গেলাফে যে ছবি-গুলি ব্যবহৃত হয়, তাঁহাদের মতে সেগুলিও "অসম্মানিত"-পর্য্যায়ভুক্ত।

হাম্বলী মজহাবের এমামগণ 'জাহেরী' বলিয়া কথিত হন। অর্থাৎ হাদিছের শব্দগুলিদ্বারা যে অর্থ বুঝা যায়, তাহার মধ্যে কোনপ্রকার 'কিয়াছ' না খাটাইয়া তাঁহারা সেই অর্থ ই গ্রহণ করিরা থাকেন। এই হিসাবে তাঁহারা বলিতেছেন—হজরত রছুলে করিম স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন যে, ছবি যদি কাপড়ে আঁকা বা ছাপা থাকে, তবে, সে ছবি ব্যবহারে কোন দোষ নাই। অতএব, লটকান থাকা-না-থাকার কোন কথাই এখানে আসিতে পারে না। তাহার পর, বিবি আএশার হাদিছের শাব্দিক অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা আরও বলিতেছেন যে, ঐ হাদিছে হজরত রছুলে করিম বলিতেছেন : 'আল্লাহ

আমাদিগকে দেওয়ালগুলিকে বস্ত্রভূষিত করার আদেশ প্রদান করেন নাই।" অতএব, ছবিযুক্ত কাপড়দ্বারা যদি কোন দেওয়ালকে আচ্ছাদিত করা হয়, তবে, সে ছবি হারাম হইবে। অবশ্য, তাঁহাদের এই যুক্তিবাদ অনুসারে চিত্রহীন বস্ত্রদ্বারা দেওয়ালকে আচ্ছাদন করাও হারাম হইবে। অতএব, হারামের প্রকৃত কারণ হইতেছে, বস্ত্রদ্বারা দেওয়াল আচ্ছাদন—চিত্র তাহার কারণ নহে।

জীব-জন্তুর চিত্রের সকল প্রকার ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ—ইহাই এদেশের আলেমগণের সাধারণ অভিমত। এই অভিমতটি যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, শাস্ত্রীয় যুক্তি ও এমামগণের উক্তিদ্বারা তাহা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করা হইল। ইহাই ছিল আমার এ-আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করা সকল অবস্থায় হারাম নহে। এখন শুধু তর্ক থাকিতেছে, সেই হারাম-হালালের কারণ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে। অর্থাৎ কি কি কারণ বিদ্যমান থাকিলে কোন্ ছবিকে জাএজ, অথবা, কোন্ ছবিকে না-জাএজ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইবে, যুক্তি-প্রমাণের দিক দিয়া এখন আমাদিগকে এই প্রশ্নের বিচার করিতে হইবে।

( ৯ )

সকল প্রকার জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করা সকল অবস্থায় নিষিদ্ধ নহে, ইহা ইতিপূর্ব্বে যথেষ্টরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কোন্ অবস্থায় জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করা হারাম হইবে, আর কোন্ অবস্থায় হালাল হইবে, সে-সম্বন্ধে দুই একটা কথা আরজ করিয়া এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিব। উপরের আলোচনায় পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে, এই কারণ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আমাদের আলেম ও এমামগণের মধ্যে অনেক

মতভেদ বিদ্যমান আছে। নিম্নে এই মতভেদগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :

(১) বস্ত্রে অঙ্কিত থাকিলে সে তছবির নির্দ্দোষ। কিন্তু, সে বস্ত্রের দ্বারা যদি দেয়াল ঢাকা হয়, তবে তাহা নিষিদ্ধ।

(২) ছুরতের ছায়া না থাকিলে তাহা নির্দ্দোষ।

(৩) জীব-জন্তুর ছবি হারাম, বে-জান বস্তুর ছবি নির্দ্দোষ।

(৪) محل تعظيم বা সম্মানের স্থলে না থাকিলে বা অসম্মানিত অবস্থায় থাকিলে জীব-জন্তুর ছবিও নির্দ্দোষ। অধিকাংশ এমাম ও আলেমগণের অভিমত ইহাই।

প্রথমের দুইটী অভিমত এক একটা হাদিছের অংশ বিশেষের অক্ষর-গত অনুসরণ মাত্র। হাদিছের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি এই মতবাদীরা আদৌ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। তাঁহাদের মত গৃহীত হইলে, পূজা ও এবাদতের উদ্দেশ্যে, অথবা, অন্য কোন প্রকার মোশরেকী ভাবের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য যে-সব চিত্র প্রস্তুত বা ব্যবহার করা হয়, সে-সমস্তও জাএজ হইয়া যাইবে। অথচ, ইহা এছলামের সমস্ত নীতি ও সকল শিক্ষার বিপরীত কথা।

তৃতীয় অভিমতটী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই সিদ্ধান্তের উভয় দিকই অসঙ্গত। "জীব-জন্তুর ছবি হারাম"—এই মতের অসঙ্গতি ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বে-জান-বস্তুর ছবি মাত্রই নির্দ্দোষ—ইহাও একটী ভ্রান্ত ধারণা। "বস্ত্রের বা অন্য কোন বস্তুর উপর ক্রুসের ছবি অঙ্কিত থাকা দেখিতে পাইলে, হজরত রছুলে করিম তাহা নষ্ট করিয়া দিতেন"—এই মর্ম্মের বিভিন্ন হাদিছ বোখারী, আবুদাউদ, আহমদ, নাছাঈ প্রভৃতি হাদিছগ্রন্থে বিদ্যমান আছে। (কেতাবুল্লেবাছ দ্রষ্টব্য)।

হজরত আদি-এবনে-হাতেম খৃষ্টান হইতে মুছলমান হইয়াছিলেন। তাঁহার গলায় একটা ক্রুস ঝুলান ছিল দেখিয়া "হজরত রছুলে করিম বলিলেন: আদি! নিজের গলা হইতে এই বোৎটা সরাইয়া ফেল (তিরমিজী, তফছির-তাওবা)। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, যাহা মোশরেকদিগের পূজার বস্তু, অথবা, যাহা তাহাদের পৌত্তলিকতার প্রতীক স্বরূপ, বে-জান হইলেও তাহা বা তাহার ছবি ব্যবহার করা হারাম। শালগ্রাম শিলা নিশ্চয়ই বে-জান, কিন্তু, তাহার ছবি ব্যবহার করার অনুমতি বোধ হয় কেহই দিতে পারিবেন না।

এখন থাকিয়া যাইতেছে ৪র্থ অভিমতটী। ইহাই অধিকাংশ এমাম ও আলেমদের মত এবং আমার বিবেচনায় ইহাই সঙ্গত অভিমত। কিন্তু, এখানে সম্মানের স্থল ও অসম্মানের স্থলগুলির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের আলেমগণ সাধারণভাবে বলিতেছেন: ছবিগুলি যদি অসম্মানিত হয়, তাহা হইলে তাহা ব্যবহার করা জাএজ। ছবি অসম্মানিত হইতেছে কি না, তাহা নির্ণয় করার জন্ত একটা সহজ নিয়ম বা স্পষ্ট মানযন্ত্র থাকা আবশ্যক। আমাদের আলেমগণ অসম্মানিত ছবিগুলির উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন: "যেমন বালিশ, গদিতে বা বিছানায় যে সব ছবি থাকে।" বলা বাহুল্য যে, ইহা সংজ্ঞা নহে—উদাহরণ। এই সংজ্ঞার অনুসন্ধানে ফেকার কেতাবগুলির অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে, গ্রন্থকারগণ বলিতেছেন: "এই শ্রেণীর ছবিগুলি নির্দোষ, কারণ ইহাতে পূজার কোন আশঙ্কা নাই।" অথবা, "এই শ্রেণীর ছবিগুলির ব্যবহার হারাম—কারণ, ইহাতে গয়রুল্লার এবাদৎ বা পূজার আশঙ্কা আছে" (হেদায়া নামাজের মকরূহাত)। ফলতঃ এইসব আলোচনার সার এই দাঁড়াইতেছে যে, ছবি জীব-জন্তুর হউক, আর কোন জড়পদার্থেরই হউক—যদি তাহা কোন

প্রকার পৌত্তলিকতার প্রতীক বা কোনরূপ মোশরেকীভাবের দ্যোতক হয়—অথবা, সেই ছবি ব্যবহারে তাহার পূজা বা এবাদতের কোন প্রকার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা যদি থাকে, তাহা হইলে সে সমস্ত ব্যবহার করা নিশ্চয়ই হারাম। পক্ষান্তরে, ঐ প্রকার আশঙ্কা বা সম্ভাবনার কোন সঙ্গত কারণ না থাকিলে জীব-জন্তুর ছবি ব্যবহার করাও নির্দ্দোষ। নিম্নে ছাহাবাগণের সময়কার দুইটা নজির উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা হইতে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

(১) যে সময় দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর শাম বা সিরিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় সেখানকার খৃষ্টানরা হজরত ওমরকে পাত্রমিত্রসহ একটী গীর্জ্জায় নিমন্ত্রণ করেন। এই নিমন্ত্রণের উত্তরে হজরত ওমর খৃষ্টান-প্রধানবর্গকে বলিয়াছিলেন:

انا لا نستطيع ان ندخل كنايسكم هذه مع الصور اللتى فيها -

অর্থাৎ—"আপনাদের এইসব গীর্জ্জায় চিত্র বা মূর্ত্তি বিদ্যমান, এ-অবস্থায় আমরা ঐগুলিতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ।" (কেতাবুল-উম ও মোছনাদে শাফেয়ী)।

(২) হিজরীর ১৬শ সনে ছাহাবাগণ পারস্যপতি কেসরার রাজধানী মদাএন জয় করেন। এই বিজয়ের পর তাঁহারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন, এবং সকলে সেখানে শোকরানার নামাজ আদায় করেন। তাহার পর—

اتخذه مسجدا و فيه تماثيل الجص رجال و خيل - و لم يمتنع و لا المسلمون لذلك و تركوها على حالها -

অর্থাৎ—"মোছলেম-বাহিনীর নায়ক (ছাআদ سعد) ঐ প্রাসাদকে মছজিদ বানাইয়া লইলেন, অথচ, তাহাতে চুণ-সুরখিদ্বারা প্রস্তুত মানুষের

ও ঘোড়ার মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। তত্রাচ, সেনাপতি নিজে, কিম্বা মুছলমানগণের মধ্যকার কেহ তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই এবং সেগুলিকে (ঐ মূর্ত্তিগুলিকে) পূর্ব্বাবস্থায় রাখিয়া দিয়াছিলেন।" (তাবরী ৩—১৭৪, মিসরী)।

প্রথমস্থানে ছুরৎ থাকার জন্য ছাহাবাগণ সে গৃহে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিতেছেন এবং দ্বিতীয়স্থানে তাঁহারাই আবার ছুরত-পূর্ণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া শোকরানার নামাজ পড়িতেছেন, ছুরৎগুলি পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান থাকার অবস্থায় সেই প্রাসাদকে মছজিদে পরিণত করিয়া সেখানে জুম্মা-জমাআত কাএম করিতেছেন, মূর্ত্তিগুলিকে না ভাঙ্গিয়া পূর্ব্বাবস্থায় রাখিয়া দিতেছেন এবং সেনাপতি, অথবা, ছাহাবাগণের মধ্যকার কেহই ইহাতে কোন দোষের কারণ দেখিতেছেন না। ইহার স্পষ্ট কারণ এই যে, প্রথম ঘটনার মূর্ত্তি বা ছবিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—পূজার উদ্দেশ্যে, অথবা, সেগুলির দ্বারা কোন মোশরেকী ভাবের অভিব্যক্তি করার নিমিত্ত। অতএব, ছাহাবাগণ সে গৃহে প্রবেশ করিতেও আপত্তি করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, কেসরার রাজপ্রাসাদের মূর্ত্তিগুলির সহিত পূজার বা অন্য কোন পৌত্তলিকভাবের কোন সম্বন্ধ ছিল না।—এইজন্য ছাহাবাগণ সেখানে যাইতে, নামাজ পড়িতে ও তাহাকে মছজিদ বানাইতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। ছবির হালাল-হারাম হওয়া সম্বন্ধে ইহাই হইতেছে প্রথম ও শেষ কথা।

এই আলোচনার প্রথমভাগে বলিয়াছি—ছবির ব্যবহার আমাদের দেশের আলেমগণও গত দেড়শত বৎসর হইতে নিয়মিতভাবে করিয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশে ডাক-টিকিটে ছবি, ষ্ট্যাম্পে ছবি, 'কোর্ট ফি'তে ছবি, নোটে ছবি, লেফাফা ও পোষ্টকার্ডে ছবি। আমাদের ভক্তিভাজন আলেমগণ দ্বিধাহীনভাবে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

সেগুলিতে ছবি ও মূর্ত্তি উভয় থাকে। এই সমস্ত ছবি ও মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া তাঁহারা মছজিদে প্রবেশ করিতেছেন, নামাজ পড়িতেছেন ও এমামতি করিতেছেন, কোর-আন হাদিছের সঙ্গে একত্রে বাক্স পেটারায় তাহা বন্ধ করিয়া রাখিতেছেন। তাঁহাদের খেদমতে এখন আমার বিনীত জিজ্ঞাস্য এই যে, এইপ্রকার ব্যবহার যে ছবি সম্বন্ধে করা হয়, তাহাকে "সম্মানিত" বলা হইবে কি না? যদি ইহা "অসম্মানিত"-পর্য্যায়ভুক্ত হয়, তাহা হইলে "সম্মানিত" বলিয়া অন্য কোন ছবিকে হারাম বলার সুযোগ যে অতঃপর তাঁহাদের খুবই কম ঘটিবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গদিতে ও গাওতকয়ায় যে সব ছবি থাকে, তাহা আলেমগণের সর্ব্বসম্মতিক্রমে "অসম্মানিত"। চিত্রসম্বলিত সংবাদপত্রে জুতা বাঁধিতেও আজকাল লোকে দ্বিধা করে না। শহরে মলমূত্রের পাত্রগুলিতেও ছবি দেখা যায়। এগুলিকে "সম্মানিত"-পর্য্যায়ভুক্ত করা কি ন্যায়-সঙ্গত হইবে?

চিত্র-সংক্রান্ত বিচারে, শরিয়তের সত্যকার বিধান অবগত হওয়ার জন্য আমি নিজের সামান্য শক্তি অনুসারে চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। এই চেষ্টার ফলে আল্লার দেওয়া জ্ঞান অনুসারে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, প্রবন্ধে তাহা অকপটভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে ইহাই শরিয়তের প্রকৃত ব্যবস্থা। যে-সব দলিল-প্রমাণের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাও বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি। মাসিক মোহাম্মদীর কতিপয় হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক ও গ্রাহক আমাকে জানাইয়াছেন—"এই সব আলোচনার ফলে সমাজের সাধারণ স্তরে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।.........সবই স্বীকার করি। তবে, ধীরে ধীরে হলেই ভাল......সবদিক রক্ষা ক'রে চলাই যে দূরদর্শিতা, তা আপনার মত লোককে বলতে যাওয়াই ধৃষ্টতা

.........ইত্যাদি।" নিতান্ত সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই যে তাঁহারা এই পরামর্শ দিতেছেন, তাহা আমি জানি এবং সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু, তবুও আন্তরিক দুঃখের সহিত তাঁহাদিগকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, মোহাম্মদীর লক্ষ্য—"সব দিক" কখনই নহে—একদিক এবং তাহা হইতেছে সত্যকার এছলাম। আমার মতে "ধীরে ধীরে" কাজ করার সময় এখন আর নাই। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে, করণীয় যাহা থাকে, যথা সত্বর সম্ভব, তাহা করিতে হইবে। গোরস্তানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা'ত আনন্দেরই কথা। ইহাইত সিদ্ধির পূর্ব্ব-সূচনা। আমার মতে সমাজের মনজুরী সাপেক্ষ হইয়া কথা বলা ও কাজ করা যাঁহাদের নীতি, সমাজের আশু পুরস্কার বা তিরস্কারের আশা-আশঙ্কাই যাঁহাদের সমাজসেবার গতি-পথকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, সমাজই তাঁহাদের নেতা, তাঁহারা সমাজের নেতা কখনই নহেন এবং সত্যকার সমাজ-সেবকও তাঁহারা হইতে পারেন না। অজ্ঞ জনসাধারণের কুসংস্কারের গড্ডলিকা প্রবাহের নাম লোকমত নহে, হইলেও তাহা ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট লোকমত। এই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট লোকমতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই নেতার, সেবকের ও সংস্কারকের প্রধান কর্ত্তব্য। জাতিকে আশু মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার ইহাই একমাত্র উপায়। আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, মুছলমান সমাজের সত্যকার কর্ম্মীদের পুরস্কারের সময় এখনও সুদূরপরাহত। এখন তাঁহাদিগকে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে সত্যকে লক্ষ্য করিয়া, পরীক্ষাকে স্বীকার করিয়া এবং কোটিকণ্ঠে তীব্র তিরস্কারকে সানন্দে বরণ করিয়া।

উপসংহারে আমি প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতেছি যে, নিজের বিচার-পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তকে ভুল-ভ্রান্তির অতীত বলিয়া মনে করার মত কুমতি আল্লাহ কখনও দেন নাই। আমার এই আলোচনার বিচার

হউক, আবশ্যক হইলে সঙ্গতভাবে তাহার প্রতিবাদ হউক, ইহা আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। ইহাতে অন্য অপেক্ষা আমিই অধিক উপকৃত হইতে পারিব বলিয়া আশা করি। এই প্রকার আলোচনা বা প্রতিবাদ মাসিক মোহাম্মদীতে সাদরে ও ধন্যবাদসহকারে প্রকাশিত হইবে।

সত্যকার এছলাম "চির-সবুজ চির-সচল।" আমাদের এক দল লোক নিজেদের সংস্কারকে শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া এই অভিযোগের কারণ হইয়াছে। কিন্তু, বস্তুতঃ যাহা এছলাম, তাহা অচল নহে, আর যাহা অচল, তাহা এছলাম নহে। সমাজের অন্য চরমপন্থীদলের এই ভুল ধারণা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই "সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক আলোচনাগুলির অবতারণা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। এই আলোচনার প্রথম কিস্তি আজ শেষ হইল। আমার এই শ্রম কতটুকু সার্থক হইতে পারিয়াছে-না-পারিয়াছে, পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

وما توفيقي الا بالله - وهو حسبي ونعم الوكيل -
نعم المولى ونعم النصير -

# সুদ-সমস্যা

## ( ১ )

### সুদ ও এছলাম

সুদ-সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আমাদের দেশে বহুদিন হইতে নানা প্রকার আন্দোলন আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। একদল আলেম কোরআন হাদিছের আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কোরআনের নিষিদ্ধ 'রেবা' এবং আমাদের দেশে প্রচলিত সকল শ্রেণীর সুদ এক জিনিষ নহে। এক কথায় Interest ও Usury-এর মধ্যে প্রভেদ প্রতিপাদন করতঃ তাঁহারা Usury কে 'রেবা' ও সেই কারণে হারাম বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। পক্ষান্তরে Interest তাঁহাদের মতে কোরআনের বর্ণিত রেবা-পর্য্যায়ভুক্ত নহে, সুতরাং তাহার আদান প্রদান হারামও নহে। আর একদল হানাফী মজহাবের বিশেষ মতবাদকে অবলম্বন করিয়া 'দারুল-হরব' ও হর্ব্বির' তর্ক তুলিয়া এদেশে বিশেষতঃ অমুছলমানের নিকট হইতে সুদ গ্রহণের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমাদের আলেম সমাজ সাধারণতঃ সকল প্রকার Usury ও Interestকেই সকল অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে হারাম বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই সব মতভেদ ব্যতীত সমাজে অন্যদিক দিয়া আর একটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। মুছলমানের ইষ্টানিষ্টের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের কোন প্রকার সম্বন্ধ কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ সুদের ব্যাপারে

লইয়া তাঁহারা প্রায়শই নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেখাইতে চাহেন যে, এছলাম ধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগে চলিতে পারে না। সুদ সমস্যাকে এজন্য তাঁহারা প্রধান নজির স্বরূপে পেশ করিয়া থাকেন।

এই সকল মতবাদের বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এখানে আমি সংক্ষেপে এইটুকু দেখাইতে চাই যে, সুদ সম্বন্ধে নানাদিক দিয়া মুছলমানের সম্মুখে যে 'সমস্যা' উপস্থিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা সমস্যাই নহে। কোরআন ও হাদিছের সরল ও সহজ বাণীগুলির প্রতি সম্যকরূপে ও যথাযথভাবে নজর না দিয়া এবং এছলামের মূল নীতিগুলির প্রতি মারাত্মকরূপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, আমরা নিজেরাই অধুনা একটা সমস্যার সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছি এবং অবশেষে চরম ধৃষ্টতার সহিত তাহাকে আল্লার পবিত্র ও শাশ্বত বিধান—এছলামের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজেদের অজ্ঞতার সহিত একটা নূতন অপকর্ম্মকে যোগ করিয়া দিয়াছি মাত্র।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আবির্ভাব হইয়াছিল যে সময়, দুনয়ার সমগ্র মানব সমাজ সে সময় পর্য্যন্ত যে সব অনাচারে কলুষিত ও যে সব অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া আসিতেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান আছে। তাঁহার আবির্ভাবের শুভ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে সব অনাচার অত্যাচারের যথার্থ প্রতিকারের কোন বাস্তব উপায় অবলম্বিত হয় নাই। বরং সত্য কথা এই যে, সে সময় পর্য্যন্ত জগতের ভাব ও চিন্তানায়কদের অধ্যকার কেহই ঐগুলির অধিকাংশকে অনাচার ও অত্যাচার বলিয়া কল্পনা করিতেও সমর্থ হন নাই। শত শত অকাট্য প্রমাণ দিয়া এই দাবীর সমর্থন করা যাইতে পারে।

হতভাগ্য দাসদাসীদিগের বিফল আর্ত্তনাদে দুনয়ার আকাশ বাতাস তখন প্রতিধ্বনিত। মাদকতা ও ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাবে সমাজ তখন

নরকে পরিণত। রাজা নামধারী একটি মানুষের খামখেয়ালীর উপর হাজার হাজার আল্লার বান্দার জীবন-মরণ তখন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত। কুসীদজীবী মহাজনদিগের অত্যাচারে মানব-সমাজ তখন সর্ব্বতোভাবে দাস-সমাজে পরিণত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর শত শত অনাচার অত্যাচারের মধ্যে, আল্লার মুক্ত আকাশের নীচে সর্ব্বপ্রথমে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইলেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা—তাঁহার বরাভয়কর উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া। তাঁহার বজ্রকণ্ঠ চরম বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এই শ্রেণীর সব অনাচারের, সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সে বিদ্রোহের সমস্ত প্রেরণা আসিয়াছিল আল্লার হুজুর হইতে এবং তাঁহারই অনুগ্রহে তাহা সম্পূর্ণভাবে সফলও হইয়া গেল। হজরতের একটী অঙ্গুলি সঙ্কেতে এক মুহূর্ত্তে মাদকতা ও ব্যভিচার আরব দেশ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল, দাস আসিয়া জননায়কের আসন গ্রহণ করিল। তাহারই এক শুভ মুহূর্ত্তে হজরত বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা প্রচার করিলেন—আজ হইতে সুদের ব্যবসায় চিরস্থায়ীভাবে বারিত। জগতের ৬০ কোটি মুছলমান আজও তাহা অবনত মস্তকে মান্য করিয়া আসিতেছে। সে সাধনা বিরাট ও বিপুল এবং তাহার সিদ্ধিও অতুলনীয়, অবর্ণনীয়।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা দেহের হিসাবে মরিয়া গিয়াছেন, বটে। কিন্তু নিজের শিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া তিনি অমৃত, অমর। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই অমর মোস্তফার কুসীদ সংক্রান্ত নির্দ্দেশটী সম্বন্ধে আজ দুই একটা কথা নিবেদন করিব। লক্ষ শত্রুর নিষ্কোষিত তরবারী ছায়ায় দাঁড়াইয়া তিনি প্রথমেই, কোরআনের ভাষায় ঘোষণা করিলেন—

يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة ـ واتقوا الله لعلكم تفلحون ـ

—"হে মোমেনগণ! তোমরা সুদ খাইও না—দ্বিগুণ-চতুর্গুণ, আর আল্লাহ সম্বন্ধে সংযত হইয়া চলিও, যেমতে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে।" আল-এম্‌রান, ১২৯।

রেবার অবৈধতা সম্বন্ধে ইহাই কোরআনের প্রথম আয়ত; ছুরা বকরার আয়তগুলি ইহার পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত ও শেষ নিষেধাজ্ঞা।

আলোচ্য আয়তে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে:— 'হে মোমেনগণ! তোমরা সুদ খাইও না।" ইহাই আয়তের বক্তব্য। "দ্বিগুণ-চতুর্গুণ" সুদের সংজ্ঞাও নহে, শর্ত্তও নহে। উহা দ্বারা কুসীদ-ব্যবসায়ের সাধারণ পরিণামটার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র। "সুদ খাইও না—দ্বিগুণ চতুর্গুণ" পদের তাৎপর্য্য এই যে, তোমরা সুদ খাইবে না—সুদের অবস্থা এই যে, আসলের সঙ্গে মিশিয়া সাধারণতঃ তাহা মূলধনের দ্বিগুণ চতুর্গুণ হইয়া দাঁড়ায় বা দাঁড়াইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর লেখক আয়তের ভাষার প্রতি কোনরূপ মনোযোগ না দিয়া এই اضعافا مضاعفة বা 'দ্বিগুণ চতুর্গুণ' শব্দ দুইটীকে লইয়া কোরআনের তফছিরে একটা অনর্থক ও অনাবশ্যক বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন।

তাঁহারা বলিতে চান যে, আয়তে "দ্বিগুণ চতুর্গুণ" বলিয়া কেবল চক্রবৃদ্ধি হারের অতিরিক্ত সুদকে হারাম করা হইয়াছে। সুতরাং এই পর্য্যায়ভুক্ত না হয় যে সুদ, তাহা অবৈধ হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "দ্বিগুণ চতুর্গুণ" বলিয়া রেবার নিষেধাজ্ঞাকে এখানে تقييد বা Qualify করা হয় নাই, উহার দ্বারা সুদের বাস্তব পরিণতির পরিচয় দেওয়া হইতেছে মাত্র। উহাকে শর্ত্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে আয়তের ভাষার প্রতি অবিচার করা হইবে। এইরূপ প্রয়োগের একটা উদাহরণ দিয়া বিষয়টাকে স্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

প্রাক্-এছলামিক যুগের আরবরা অভাব ও দারিদ্র্যের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিত। এই মহা পাপের নিবারণকল্পে কোরআনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইল :—

و لا تقتلوا اولادكم خشية املاق

"তোমরা নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিও না—অভাবের আশঙ্কা বশতঃ (এছরাইল)। আলোচ্য আয়তের ন্যায়, এখানে উদ্দেশ্য হইতেছে সকল শ্রেণীর সন্তান হত্যাকে নিবারণ করা। কিন্তু যেহেতু আরবরা সে সময় এই মহাপাতকে লিপ্ত হইত সাধারণতঃ অভাবের আশঙ্কা করিয়া, সেই জন্য "অভাবের আশঙ্কা বশতঃ"—বলিয়া সমাজের একটা অবস্থাকে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইতেছে মাত্র। বস্তুতঃ ইহা সন্তান হত্যার নিষেধাজ্ঞার কারণও নহে, শর্ত্তও নহে। অন্যথায় স্বীকার করিতে হইবে যে, দারিদ্র্যের আশঙ্কা বশতঃ না হইলে, নিজের সন্তানদিগকে হত্যা করা এই আয়ত অনুসারে বৈধ। ঠিক এইরূপ, "দ্বিগুণ চতুর্গুণ" কথাটী সুদের নিষেধাজ্ঞার শর্ত্তও নহে, কারণও নহে।

ছুরা বক্রার আয়তটী সুদ সম্বন্ধে শেষ নিষেধাজ্ঞা। এমন কি, এবনে আব্বাছের এক বর্ণনায় জানা যায় যে, ইহাই 'আহ্কাম' বা আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে কোরআনের শেষ আয়ত। এই শেষ নিষেধাজ্ঞায় রেবা মাত্রকে অবৈধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বলিয়া তাহার কোন বিশেষণ সেখানে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং এখানে "দ্বিগুণ চতুর্গুণকে" নিষেধের শর্ত্ত হিসাবে গ্রহণ করা হইলেও, শেষ আয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে উহাকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে, মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আয়তগুলিকে যেরূপভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। "নেশার অবস্থায় নামাজে প্রবৃত্ত হইও না" (নেছা, ৪৩)—প্রাথমিক অবস্থার আদেশ। পরবর্ত্তী আদেশে সর্ব্বপ্রকার মাদককে সকল অবস্থায় অবৈধ বলিয়া

ব্যাপকভাবে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শেষ আয়তকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রথম আয়তকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিলে, নামাজের ক্ষতি না হয়—এমনভাবে মদ্যপান করা বৈধ হইবে।

এই আলোচনা হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, রেবার চরম ও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল—হজরতের জীবনের শেষ সময়, এছলামী ষ্টেটের অর্থ-নৈতিক বিধি-ব্যবস্থা ও তাহার অবদান-উপকরণগুলি সম্পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার পর। একটু মনোযোগ সহকারে কোরআন পাঠ করিলে সহজে জানা যাইবে যে, জাকাতের আদেশের সঙ্গে রেবার নিষেধাজ্ঞার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষকে কুসীদজীবী শাইলকদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, এছলামের বিধান অনুসারে বায়তুল-মাল তহবিল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করা আবশ্যক।

( ২ )

## কুসীদ নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থ ইতিহাস

দুন্‌য়ার বহু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, বহু সমাজ-সংস্কারক ও বহু ব্যবস্থা-প্রণেতা আবহমান কাল হইতে কুসীদ সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই বহু বিশ্রুত উন্নত যুগ পর্য্যন্ত, দুঃস্থ মানবতাকে কুসীদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার জন্য বা রক্ষা করার অজুহাতে তাঁহারা নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। কুসীদ ব্যবসায়ের এই ইতিহাসটা সম্যকভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইবে যে, একমাত্র দীন-দয়াল মোহাম্মদ মোস্তফা ব্যতীত আর কেহই এই সর্ব্বনাশকর সমাজ-

ব্যাধির আসল নিদানটা বুঝিয়া উঠিতে অথবা তাহার প্রতিকারের যথাযথ উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। হজরতের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থাপক ও সংস্কারকবর্গ একদিকে, কুসীদ ব্যবসায়কে আদৌ অবৈধ ও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না, অন্যদিকে অভাবগ্রস্ত দীন-দুঃখীকে তাঁহাদের কেহই এমন কোন পথ দেখাইয়া দিতেছেন না, যাহাতে সর্ব্বগ্রাসী মহাজনদিগের দ্বারস্থ না হইয়াও তাহারা অভাবে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। এ সম্বন্ধে আর একটী সত্য কথা এই যে, অর্থনীতির কোন উদার, মহান ও বিশ্বজনীন দৃষ্টি লইয়াও আর কেহ এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে একটা-না-একটা ধনিক স্বার্থের নির্দ্দেশ অনুসারে। কোন একটা সুদৃঢ় নীতি ও সুমহান আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না, এখনও নাই। এখানে সে সব কথা বলা অসম্ভব হইলেও সংক্ষেপে তাহার একটু পরিচয় না দিয়া পারিতেছি না।

আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থা-গ্রন্থ হইতেছে মনু-সংহিতা। কুসীদ গ্রহণ সম্বন্ধে বহু বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ এই সংহিতায় আছে, সত্য; কিন্তু তাহার ভীষণতাকে কম করার কোন চেষ্টাও এই সংহিতাকার করেন নাই—নিবারণের চেষ্টা'ত দূরের কথা। এই সংহিতায় কুসীদজীবী মহাজনদিগকে দুইগুণ হইতে পাঁচগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে (৮—১৫১)। বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মোশির (মূছার) সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পরবর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত এছরাইল বংশের নবীরা স্বজাতীয় জনসাধারণকে কুসীদজীবী মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছেন, অথচ সে চেষ্টা ও তাঁহাদের সে সব ব্যবস্থা কার্য্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। মোশি সদা প্রভুর নামে এছরাইলবংশের ধনিকদিগকে নিষেধ করিতেছেন—তাহারা

যেন **"স্বজাতীয়** কোন দীন-দুঃখীকে" টাকা ধার দিয়া তাহার উপর সুদ না চাপায় (যাত্রাপুস্তক, ২২—২৫, ২৬)। দ্বিতীয় বিবরণেও এই উপদেশ দিয়া বলা হইতেছে—"সুদের জন্য বিদেশীকে ঋণ দিতে পার, কিন্তু সুদের জন্য আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবে না" (২৩—২০)। কুসীদ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে যে হীনাদপি হীন মানসিকতার এবং যে নির্ম্মম শোষণ প্রবৃত্তির উপর, মানবতার মহত্তম আদর্শের হিসাবে স্বদেশী বিদেশী প্রভৃতি বলিয়া তাহার মধ্যে তারতম্য কিছুই হইতে পারে না। বাইবেলের নির্দ্দেশ এই যে, এছরাইলীয়রা বিদেশী বা পরজাতীয়দের নিকট হইতে যথাসাধ্য শোষণ করিতে থাকুক, তাহাতে অবৈধ বা অসঙ্গত কিছুই নাই, স্বজাতীয়দের সম্বন্ধে একটু সতর্ক হইয়া চলিলেই হইল। এই নীতিহীন আদর্শহীন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ফলে এহুদী জাতি আজ শাইলকের জাতি বলিয়া দুনয়ার সর্ব্বত্রই চরমভাবে অভিশপ্ত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই কুসীদ ব্যবসাই তাহাদিগকে ইউরোপময় এমন ঘৃণ্য ও অত্যাচারের পাত্রে পরিণত করিয়াছিল। সুদ দেওয়াতে জাতির যে বৈষয়িক ক্ষতি, (বাইবেলের বর্ণনা মতে) এছরাইলীয় নবীদিগের দৃষ্টি সেই ক্ষতিটুকুতেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সুদ গ্রহণ করাতে, বিশেষতঃ সমাজে তাহার আবাদ প্রচলনের ফলে, জাতির আত্মার যে শোচনীয় অধঃপতন ঘটে, এহুদী জননায়করা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাইবেল পাঠ করিলে খুবই পরিষ্কারভাবে জানা যাইবে যে, তাঁহাদের এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিও চরিতার্থ হইতে পারে নাই। প্রবৃত্তি হীন হইয়া গেলে স্বজাতি বিজাতির বিচার আর মানুষের থাকে না। তাই ভাববাদী ইলীশায়ের সমসাময়িক ইতিহাসেও দেখা যাইতেছে যে, এছরাইলীয়-পিতা এছরাইলীয় মহাজনের কবলে পড়িয়া দাসরূপে মরিয়া যাওয়ার পর, তাহার পুত্রদ্বয়কে আবার দাসরূপে

পাওয়ার জন্য সেই মহাজন আসিয়া স্বজাতীয় খাতকের বিধবা স্ত্রীকে পীড়ন করিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হইতেছে না। (২ রাজাবলি ৪—১) নহিমিয় ৫ম অধ্যায়ে এবং যিশাইয় ৫ম অধ্যায়ের প্রথমভাগে মহাজন-পীড়িত দীন-দুঃখীদিগের আর্ত্তনাদ সমানভাবেই শোনা যাইতেছে। যাহা হউক, উদার দৃষ্টি, সুদৃঢ় নীতি ও মহান আদর্শের অভাবে, বাইবেলের সমস্ত ব্যবস্থা এবং এছরাইলীয় ভাববাদীদিগের সমস্ত চেষ্টাই যে একটা ব্যর্থ-বিড়ম্বনা মাত্রে পরিণত হইয়া রহিয়াছিল, বাইবেল-বিশেষজ্ঞরাও তাহা স্পষ্টভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। (দেখ—Ency. Biblica. Art Law and Justice, 16)।

শাস্ত্রকারদিগের ন্যায় বিভিন্ন জাতির আইন-প্রণেতারাও এ সম্বন্ধে যত প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন বা এখনও করিতেছেন, নীতি ও আদর্শের অভাবে তাহার কোনটীও কোন প্রকার স্থায়ী সুফল প্রদান করিতে পারে নাই। সুদখোর মহাজনদিগের অত্যাচারে প্রাচীন গ্রীসের জনসাধারণ যখন একেবারে দাসজাতিতে পরিণত হইয়া যাইতেছিল, সেই সময়, খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৯৪ সনে, সোলোন-আইন বা Solon's legislation প্রণীত হয়। যেসব ঋণ খাতকদিগের দেহের বা সম্পত্তির জামিনে সে সময় পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছিল এবং যে ঋণের মূলধনের বহু গুণ অধিক সুদ তাহার পূর্ব্বে মহাজনদিগের হস্তগত হইয়াছিল, এই আইনের ফলে তাহাকে অগ্রাহ্য করা হইল। কিন্তু হৃতসর্ব্বস্ব দীন দুঃখীরা অল্পদিন যাইতে না যাইতে আবার মহাজনদিগের কবলে পতিত হইল।

রোম সাম্রাজ্যের জনসাধারণের অবস্থাও তখন এইরূপ শোচনীয়। মহাজনরাই প্রভু আর খাতকরা সপরিবারে তাহাদের দাস, এই ছিল সে দেশের সাধারণ পরিস্থিতি। এই সময়, খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ সনে একটী আইন পাস করিয়া সেখানে সুদের উচ্চতম হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া

হয়। কিন্তু এই আইন সত্তেও, in the course of two or three centuries the small free farmers were utterly destroyed ... ...and debt ended practically, if not technically, in slavery. অর্থাৎ দুই বা তিন শতাব্দীর মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন কৃষি যোতগুলি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং ঋণের ফলে জনসাধারণ, আইনতঃ নাই হউক, কার্য্যতঃ দাসজাতিতে পর্য্যবসিত হইল। *

খৃষ্টান ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের ও প্রসার লাভের পর, পাদ্রী-পুরোহিতরা কুসীদের অবৈধতা প্রমাণ করার জন্য খুব জোর দিতে লাগিলেন, সত্য। কিন্তু সুদ নিবারণের চেষ্টার পূর্ব্বে ঋণ নিবারণের কোন চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ইহার ফলে খৃষ্টানরা সুদের ব্যবসায় বর্জ্জন করিল, আর তাহাকে একচেটিয়া ভাবে অধিকার করিয়া বসিল সেই সব দেশের এহুদী অধিবাসীরা। তখন জাতির হিসাবে খৃষ্টান হইল খাতক আর এহুদীরা হইল মহাজন—ঠিক যেমন করিয়া সুদের ব্যবসায়টা আমাদের দেশের হিন্দু মহাজনদিগের হস্তগত হইয়া গিয়াছে। এই সময়, শোষক ও শোষিতের মধ্যে এমন কঠোর বৈরীভাবের সৃষ্টি হয় এবং এহুদী মহাজনদিগের অত্যাচার এমন চরম সীমায় উপনীত হইয়া যায় যে, তৃতীয় হেনরী নিউ-ক্যাসেল ও ডার্ব্বিকে যে 'চার্টা' প্রদান করেন, তাহাতে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, কোন এহুদীই এই সব স্থানে বাস করিতে পারিবে না। ইংলণ্ডের বিখ্যাত Magna Charta বা রাজকীয় ছনদের * ১০ ও ১১ ধারায় মৃত খাতকের বিধবা স্ত্রী ও নাবালেগ ওয়ারেছদিগকে এহুদী

---

+ Ency, Bri. Usury.

* ১২১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জনের নিকট হইতে গৃহীত ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অধিকারের মহাছনদ।

মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে আংশিকভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা—এবং সেই সব রক্ষা কবচ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাওয়ার ফলে ইংলণ্ডের ধনতান্ত্রিক ভাবাপন্ন মনীষী ও রাজনৈতিক নেতারা ১২৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত পর পর কতকগুলি আইন পাস করিয়া যান। এই আইনগুলি ইংলণ্ডের Usury Laws বলিয়া বিদিত।

আইন বহুত প্রণীত হইল, কিন্তু মূল ব্যাধির প্রতিরোধের বা প্রতি-কারের দিক দিয়া উপকার বিশেষ কিছু হইল না। বরং এই নীতি ও আদর্শহীন প্রচেষ্টার ফলে দেশময় একটা উল্‌টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া গেল এবং অবশেষে পার্লামেণ্টের পূরা ৩৫ বৎসরের বাদপ্রতিবাদ ও কলহকোন্দলের পর, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এক আইন পাস করিয়া, সুদ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্ব্বের সমস্ত আইনগুলিকে একেবারে রহিত করিয়া দেওয়া হইল। সে সময় ইংলণ্ডে সমবায় সমিতি, ঋণদান সমিতি ও অন্যান্য সকল প্রকারের ব্যাঙ্ক যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তথাচ অর্দ্ধ শতাব্দী যাইতে না যাইতে ইংলণ্ডের গগন পবন দুস্থ দুর্গত জনসাধারণের করুণ আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং অবশেষে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আবার ইংলণ্ডকে বাধ্য হইয়া সুদ-নিয়ন্ত্রণের জন্য নূতন আইন পাস করিতে হইল। কিন্তু তাহাও আজ ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। পুরাতন ও নূতন প্রণালীর নানাপ্রকারের কুসীদ ব্যবসায়ের ফলে ভারতের জনসাধারণ আজ হৃত-সর্ব্বস্ব। অভিজ্ঞরা হিসাব করিয়া বলিতেছেন, ভারতের এক কৃষক সমাজের ঋণই ৯০০ কোটি টাকা। ইহার সুদ হয় বার্ষিক কমবেশী ১৭০ কোটি, টাকা। গত এক যুগের মধ্যে এই ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া সরকারী বিবৃতিতেও স্বীকৃত হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং

ইঙ্কয়ারি কমিটীর মতে বাঙ্গলার কৃষকদিগের তখনকার মোট ঋণ ১০০ কোটি টাকা—প্রত্যেক কৃষক-পরিবারের গড়পড়তা ঋণ ১৬০ টাকা। বহু ক্ষেত্রে সুদে আসলে মিলিয়া মিলিয়া মহাজনের দেওয়া প্রকৃত মূলধন 'দ্বিগুণ-চতুর্গুণ'-ভাবে বাড়িতে বাড়িতে কৃষকদের ঋণভার এইরূপ দুর্ব্বহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যতদূর স্মরণ হয়, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম আইন পাস করিয়া সুদ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই আইন দুঃস্থ দীন দুঃখীর কাণাকড়িরও উপকারে আসে নাই, বরং এই ১৫ বৎসরে তাহাদের ঋণের ভার বহু পরিমাণে বাড়িয়াই গিয়াছে। ১৯৩২ সালে আবার এক আইন পাস করিয়া কুসীদ ভার প্রপীড়িত জনসাধারণের দুর্দ্দশার আংশিক প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই ভীষণ ধ্বংস স্রোতের গতিরোধ করা তাহাতেও সম্ভবপর হইল না। তাই এবার গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং "Bill for the Relief of Rural Indebtedness বলিয়া আবার এক নূতন প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন। মজ্জমান মানুষ যেমন সম্মুখস্থ তৃণকে অবলম্বন করিয়াও বাঁচিবার চেষ্টা করে, দেশের জনসাধারণ সেইরূপ এই শ্রেণীর আইনগুলির প্রতি তাকাইয়া প্রতিকারের আশায় আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। কিন্তু দুনয়ার গত তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস আজ একবাক্যে বলিয়া দিতেছে যে, এসব প্রতিকার প্রতিকারই নহে। বরং শোষণকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে শোষিতকে একেবারে মরিতে না দেওয়ার স্বার্থবুদ্ধিই এই সব প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা। বস্তুতঃ এছলামের নির্দ্ধারিত প্রতিকারের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত দুনয়াকে কুসীদের অভিশাপ হইতে মুক্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এছলাম এই সর্ব্বনাশ স্রোতের গতিরোধ করিয়াছে—একদিকে রেবা বা কুসীদের ব্যবসায়কে কঠোর ও ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করিয়া, অন্যদিকে—সুদ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্ত্তে—ঋণ নিবারণের চিরস্থায়ী

ও বাস্তব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া। আজ হউক, কাল হউক, আর দু'দিন পরে হউক, জগতকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এছলামের এই সমাধান ব্যতীত দুস্থ মানবতার বর্ত্তমান ঋণ সমস্যার বা সুদ সমস্যার অন্য কোনই সমাধান নাই। সুদ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া, জনসাধারণের অভাবের মাত্রাকে দিন দিন বাড়াইয়া এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঋণকে সহজলভ্য করিয়া দিয়াই দুনয়া এযাবৎ এই নির্ম্মমতার চিত্রকে নির্ম্মমতর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এছলাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহার বিশাল সাম্রাজ্যগুলির দিকে দিকে তাহার অবলম্বিত নীতির ও আদর্শের সফলতা নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

কুসীদ বা Usury সম্বন্ধে আধুনিক জগতে যে সব আলোচনা হইয়াছে এবং তাহার ফলে সুদ নিয়ন্ত্রণের যে সব 'ফর্ম্মুলা' আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সমস্তের গোড়ার কথা হইতেছে Security বা জামিন। যাহার জামিন যত নিরাপদ বা মূল্যবান, সে সেই অনুপাতে কম সুদে ঋণ পাওয়ার অধিকারী, ইহাই হইতেছে সকল দিকের সার সিদ্ধান্ত। কিন্তু দুনয়ার দুঃস্থ দীনদুঃখীদিগের মধ্যে এরূপ লোক অনেক আছে, জামিন দেওয়ার মত সম্পত্তি অথবা ঋণ পরিশোধ করার মত সঙ্গতি যাহাদের একেবারেই নাই। ইহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কোন প্রতিকারও সভ্যজগতের কাছে নাই। ইহারও একমাত্র আইন সঙ্গত প্রতিকার—এছলাম।

( ৩ )

## সুদ ও জাকাত

সভ্যতার প্রথম দিন হইতে, Capitalism বা ধনতন্ত্রবাদ ও Imperialism বা সাম্রাজ্যবাদ পরস্পরের হাত ধরিয়া অগ্রসর হওয়ায়

চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। দুনয়ার অধিকাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রকৃত কারণ যে ইহাই, ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে নিজেদের অতি হীন ধনতান্ত্রিক স্বার্থের মোহে অন্ধ হইয়া স্বদেশের মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিতে এহুদী জাতি যে কখনই চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, এহুদ-ইতিহাসের ইহা সর্ব্বপ্রধান সত্য। গত মহাযুদ্ধেও জার্ম্মাণ জাতির শোচনীয় পরাজয়ের একটা বড় কারণ জার্ম্মাণ-এহুদীরাই। এছলামের অর্থনীতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জাতীয় সম্পদকে মুষ্টিমেয় ধনিকের কবলগত করার যে নীতি, তাহারই নাম Capitalism বা ধনতন্ত্রবাদ। আর এছলামী অর্থ-নীতির অন্যতম কথা হইতেছে ধনের নিষ্কেন্দ্রীকরণ। এহুদীদের জাতীয় মনের সহিত এছলামের প্রধান সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এই নীতিকে অবলম্বন করিয়া। বিদেশী কোরেশদিগের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া মদীনার এহুদীরা প্রত্যক্ষভাবে মুছলমানের ও পরোক্ষভাবে স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, এই হীন মানসিকতার ফলে। তখনকার দিনে এই কুসীদ ব্যবসায়ই ছিল তাহাদের শোষণ প্রবৃত্তির প্রধান সহায় ও হীন-মানসিকতার প্রধান কারণ। তাই কোরআনে এহুদীদিগের জাতীয় চরিত্রের আলোচনা এবং বদর ও ওহোদ যুদ্ধের বর্ণনা উপলক্ষে মুছলমানকে প্রাসঙ্গিকভাবে কুসীদ ব্যবসায়ের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে নিষেধ করা হইতেছে—যেন তাহাদের জাতীয় চরিত্রও এইরূপে অভিশপ্ত ও অধঃপতিত হইয়া না পড়ে। সুদ প্রদান করিয়া স্বজাতি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, ইহাই আর সকলের চিন্তা। কিন্তু এছলাম সুদ প্রদান অপেক্ষা মুছলমানকে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছে, সুদ গ্রহণ করিতে। কোর-আনের কুত্রাপি সুদ প্রদান সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ করা হয় নাই। কারণ বৈষয়িক হিসাবের সাময়িক লাভ লোকসান অপেক্ষা

জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ অপকর্ষকে বড় করিয়া দেখাই তাহার চিরাচরিত নীতি ও শাশ্বত আদর্শ।

এছলামের স্পষ্ট ও অপরিহার্য্য নির্দ্দেশ এই যে, সঙ্গতভাবে নিজের সংসার-ব্যয় নির্ব্বাহ করার পর মানুষের যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহার অধিকারী কেবল সেই একা নহে। তাহার শতকরা ২॥০ টাকা দেশের দুঃস্থ দীনদুঃখীদিগের অধিকারভুক্ত। খলিফা প্রত্যেক ধনিকের নিকট হইতে এই কর আদায় করিবেন। এইরূপে ক্ষেত্রস্বামীদিগের নিকট হইতে অবস্থা বিশেষে উৎপন্ন ফসলের ১/১০ বা ১/২০ অংশ তিনি আদায় করিয়া লইবেন। শস্যের ন্যায় ফল ও পশুপালের উপরও এই প্রকার কর বা জাকাতের ব্যবস্থা আছে। এগুলি বাধ্যতামূলক, কেহ না দিলে তাহার সঙ্গে জেহাদ করার ব্যবস্থা। ইহা ছাড়া অন্য প্রকারের 'ছাদাকাৎ' হইতেও এই তহবিল পুষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারে মোছলেম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে তহবিল সঞ্চিত হইবে, সরঞ্জামী খরচের জন্য তাহার মাত্র ১/৮ ব্যয় করা যাইতে পারিবে, অবশিষ্ট ৭/৮ ব্যয় করিতে হইবে, দুঃস্থ দরিদ্র ও বিপন্ন জনসাধারণের সেবায় এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে। কোরআন ইহাকে দরিদ্র জনসাধারণের 'স্বত্বাধিকার' বলিয়া প্রচার করিয়াছে। ছুরা নেছার 'ছাদাকাৎ' সংক্রান্ত আয়তে ইহাকে فريضة من الله আল্লার প্রদত্ত নির্দ্দেশ বা Ordinance বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে ( ৯—৬০ )। এখানে ঋণের কথা নাই, সুদের প্রসঙ্গ নাই, জামিনের প্রশ্ন নাই, ভিক্ষার অপমান নাই। বলা আবশ্যক যে, ইহা আদর্শবাদের স্বপ্নও নহে, কর্ম্মবিমুখের অবাস্তব কল্পনাও নহে। এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিয়া, এছলাম নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদন করিয়া দেখাইয়াছে যে, সুদ সমস্যার বা ঋণ সমস্যার একমাত্র প্রতিকার ইহাই।

এছলামের আদেশ নিষেধগুলি ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই জানা যাইবে যে, সেখানে প্রত্যেক নিষেধের সহিত একটা আদেশ এবং প্রত্যেক বর্জ্জনের সঙ্গে একটা অর্জ্জন অঙ্গাঙ্গীভাবে সুসজ্জিত হইয়া আছে। সেই বর্জ্জন ব্যতীরেকে অর্জ্জন নিষ্ফল—বহুক্ষেত্রে অসম্ভব। অনেক সময় আমরা এই অর্জ্জন ও বর্জ্জনের দুইটা দিকের মধ্যে একটাকে ত্যাগ করিয়া বসি, এবং বিচারের সময় একদ্দিকের অর্দ্ধেক মাত্র সম্মুখে রাখিয়া দুই দিকের সম্পূর্ণ জিনিষটার পূর্ণ কল্যাণ তাহার মধ্যে খুঁজিয়া হয়রান হইয়া পড়ি। বীজের একটা ভাগ বা এক একটা ভাগকে স্বতন্ত্রভাবে মাটিতে পুঁতিলে তাহাতে যেমন অঙ্কুর-উদ্গম হইতে পারে না, এই শ্রেণীর অর্জ্জন বর্জ্জনের আদেশ নিষেধগুলিকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া, আল্লাহ-রছুলের নির্দ্ধারিত কল্যাণকে প্রাপ্ত হওয়া তেমনি মুছলমানের পক্ষে সম্ভব হইয়া ওঠে না।

অধিকাংশ স্থলে মানুষ সুদ দিতে বাধ্য হয়—অভাবে পড়িয়া। দৈব দুর্ব্বিপাকে এ অভাবের হাতে জনসাধারণকে অনেক সময়ই পড়িতেই হয়। এই অভাবের সময়ই মানুষ 'শাইলক'রূপী নরখাদক মহাজনগণের দ্বারস্থ হইতে এবং উচ্চহারে সুদ স্বীকার করিয়া টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। মানুষের এই সব সাময়িক অভাব পূরণের সুব্যবস্থা যতদিন না করা হয়, ততদিন তাহাকে কর্জ্জ করিতে নিষেধ করা, নিষ্ফল ও অস্বাভাবিক প্রহসন মাত্র। আমাদের আলেম সমাজ এই প্রহসনের ব্যর্থ অভিনয় অবিরামভাবে করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ওয়াজ নছিহত কোন অভাবগ্রস্তের তীব্র জ্বালাকে নিবারণ করিতে বা সুদখোর মহাজনের দ্বার হইতে তাহাকে সরাইয়া আনিতে সমর্থ হয় নাই। সুদ খাওয়া ও সুদ দেওয়া **উভয়ই সমান**—এই হাদিছটী লক্ষ কণ্ঠে প্রতি-ধ্বনিত হওয়া সত্বেও, আজ হাজার হাজার মুছলমান বিধর্ম্মী মহাজনের করাল

কবলে আত্মসমর্পণ করিয়া পথের ভিখারী হইয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে—ইহার কারণ কি ?

আল্লার কোরআন যেমন সুদকে বর্জ্জন করার আদেশ প্রদান করিয়াছে, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে জাকাত প্রদান করার কড়া হুকুমও প্রচার করিয়া দিয়াছে। 'সঙ্গে সঙ্গে' বলিলে ভুল হয়—জাকাতের বিধি ব্যবস্থাকে মুছলমান সমাজে উত্তমরূপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া, তাহার পর অবশেষে সুদকে হারাম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সুদের আয়ৎ ও জাকাতের আয়তের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহা সহজেই জানা যাইতে পারিবে।

সুদ হারাম হওয়া আর জাকাত ফরজ হওয়া, এছলামের দুইটী যৌগপতিক আদেশ। জাকাতের ফরজকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিয়া সুদকে বর্জ্জন করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে জাকাতের আদেশকে যথাযথ ভাবে পালন করার পর দেশে এমন একটীও অভাবগ্রস্ত মুছলমান বর্ত্তমান থাকিতে পারে না - দৈবদুর্ব্বিপাকের বা সাময়িক অভাবের জন্য যাহাকে দায়ে ঠেকিয়া সুদখোর মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হইবে।

আমার একজন বিশেষজ্ঞ বন্ধু সংযত ভাবে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক বাঙ্গলার মুছলমান যথাবিধি জাকাতের আদেশ পালন করিয়া চলিলে, এদেশ হইতে 'বাইতুল মাল' তহবিলে প্রতি বৎসর অন্ততঃ তিন কোটি টাকা সংগ্রহ হইতে পারে। বাঙ্গলা দেশে দুই একস্থানে এখনও এই 'বাইতুল মালের' সুব্যবস্থা আছে এবং সেজন্য স্থানীয় মুছলমানদিগকে কখনই সুদখোর মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয় না। সুদ দেওয়া হারাম, আর জাকাত দেওয়া ফরজ—অর্থাৎ জাকাত না দেওয়া, হারাম। দুইটীই কোরআনের আদেশ, দুইটীই এছলামের ব্যবস্থা এবং

ইহার প্রত্যেকটী অঙ্গের উপর নির্ভরশীল। আমরা আল্লার হুকুমের এক অংশকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরার চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু তাহাকে সার্থক করার জন্য অন্য যে অংশের অগ্রেই আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেছি। তাই আমাদের অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা এক সঙ্গে মিলিয়া দুনয়ার যত সমস্যা আনিয়া আমাদের চলার পথকে বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিতেছে—আর আমরা নিজেদের সেই অজ্ঞতা ও অবজ্ঞার কুফলগুলিকে অবলীলাক্রমে এছলামের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া, সংস্কার বা সংহারের নামে বাবদুকতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

সাধারণভাবে এই কথাগুলি নিবেদন করার পর, আমি এখন সুদ সংক্রান্ত কএকটি হাদিছের প্রতি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা দ্বারা আমার বক্তব্য বিষয়টী শাস্ত্রের হিসাবে আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। 'সুদ খানেওয়ালা আর দেনেওয়ালা দোনোঁ বরাবর'—সুদের ওয়াজ ও আলোচনা প্রসঙ্গে সর্ব্বদাই এই হাদিছটীর আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। আবার "আধুনিক" লেখকেরাও এই হাদিছের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া অন্যান্য মোল্লা-মৌলবীদিগকে জব্দ করার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—যখন উভয়ের গোনাহ্ বরাবর, আর যখন হাজার হাজার মুছলমান সুদ দিয়া নিত্যই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে, তখন দশ পাঁচজন সুদ খাইতে আরম্ভ করিলে তাহাদের উপর খড়্গহস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, এই হাদিছটীকে সকল পক্ষই বেশ ভাল করিয়া জানেন ও মানেন, এবং জনসাধারণের মধ্যে এই হাদিছের প্রচারও যথেষ্ট আছে। এই জন্য আমরা সর্ব্বপ্রথমে এই হাদিছটীর মূল ও অনুবাদ উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

হজরত রছুলে করিম, সুদের দাতা, গৃহীতা এবং লেখক ও সাক্ষীগণকে লা'নৎ করিয়াছেন—এই মর্ম্মের কয়েকটি হাদিছ কিছু কিছু পরিবর্ত্তন

সহকারে মোছলেম, নাছাই ও কনজুল ওম্মাল প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। "তাহারা সমান" এই অংশটী মোছলেমে জাবেরের রেওয়াতে পাওয়া যায়। নাছাই হজরত আলী হইতে বর্ণনা করিতেছেন:—

عن علی انه سمع رسول اللّٰه صلعم ; لعن آكل الربوا و موكله و كاتبه و مانع الصدقة -

আলী বলেন—আমি হজরতকে সুদ-দাতার, সুদ-গৃহীতার, তাহার লেখক ও সাক্ষীগণের এবং জাকাত দানে অস্বীকৃত ব্যক্তির উপর লা'নাৎ করিতে শুনিয়াছি। (১)

হজরত জাবেরের, হজরত আলীর এবং অন্যান্য ছাহাবাগণের বিভিন্ন রেওয়াতগুলি এক সঙ্গে করিয়া লইলে আমরা হাদিছটীর পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হইতে পারি। এই হিসাবে হাদিছের ভাবার্থ এইরূপ দাঁড়ায়:— হজরত সুদ-দাতা, সুদ-গৃহীতা, সুদের সাক্ষী, সুদ সংক্রান্ত দলিলের লেখক ও জাকাত প্রদানে অসম্মত ব্যক্তির উপর লা'নাৎ করিলেন এবং বলিলেন—তাহারা সমান। (২) আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি যে, হজরত রছুলে করিম জাকাত দানে অসম্মত ব্যক্তিকে সুদ-দাতা ও গৃহীতা প্রভৃতির সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দিতেছেন। কারণ সুদ দিয়া এবং সুদ সংক্রান্ত দলিলের লেখক ও সাক্ষী হইয়া একদল লোক যেমন মহাজনকে সুদ খাইতে সাহায্য করিয়া থাকে, সেইরূপ জাকাত দানে

(১) এই হাদিছটী কনজুল ওম্মালেও বিভিন্ন রাবী কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

(২) 'সব সমান' কথার সচরাচর যে অর্থ করা হয়, তাহা ঠিক নহে। একজন অর্থগৃধ্নুতার জন্য বিপন্ন প্রতিবেশীর হৃৎপিণ্ড চর্ব্বণ করিতে উদ্যত, আর একজন নিতান্ত দায় ঠেকিয়া নিরুপায় অবস্থায় তাহাকে সুদ দিতে স্বীকৃত হইয়া আপাততের মত আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে—এই দুই জনের পাপ সমান, ইহা কখনই হাদিছের উদ্দেশ্য নহে। দেখ মেরকাত প্রভৃতি।

অসম্মত ব্যক্তি জাকাত বন্ধ করিয়া অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুদী কর্জ্জ লইতে বাধ্য করিয়া থাকে। ফলে এই ব্যক্তিই হইতেছে তাহার কর্জ্জ লওয়ার ও সুদ দেওয়ার প্রধান কারণ। সে ও তাহার সমশ্রেণীর অবস্থাপন্ন লোকেরা যথাবিধি জাকাত আদায় দিলে 'বায়তুল মাল' তহবিল হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া গরিবটী বর্ত্তমান অভাবের দায় হইতে মুক্তি পাইতে পারিত,—সুতরাং মহাজনের দ্বারস্থ হওয়ার কোন কারণই তাহার ঘটিত না।

বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাবর্গকে এখন আমরা ছুরা 'বকরার' ৩৮ রুকু এবং ছুরা 'রুমের' ৪র্থ রুকু—উপক্রম উপসংহার সহ—পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। এই রুকু দুইটী মোটামুটিভাবে পাঠ করিলেও সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'আলার শাশ্বত বাণী কোরআন ঐ সকল স্থানে সুদ বর্জ্জনের সহিত জাকাতকে কিরূপ অভেদ্যভাবে একত্র গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। ছুরা 'বকরার' ৩য় রুকুতে প্রথমে দানশীলতার মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে এবং তাহার অব্যবহিত পরে কুসীদজীবীর মানসিক বৃত্তির কঠোর নিন্দাবাদ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইতেছে :—

يمحق الله الربوا و يربى الصدقات' و الله لا يحب كل
كفار اثيم -

অর্থাৎ—"আল্লাহ সুদকে কল্যাণ প্রাপ্ত হইতে দেন না, এবং জাকাতকে তিনি বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন, আর কোন অকৃতজ্ঞ মহাপাতকীকে আল্লাহ ভালবাসেন না।" (৩৭৬)। ইহার পরবর্ত্তী আয়তে আবার বলা হইতেছে—"যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল এবং যাহারা নামাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে ও **জাকাত প্রদান করিতে থাকে,** স্বীয় প্রভুর সন্নিধানে তাহাদের পুরস্কার (নির্দ্ধারিত হইয়া) আছে; তাহাদের কোনও ভয় নাই, আর তাহারা মর্ম্মাহতও হইবে না।"

ছুরা 'মরয়মের'ও খুব সংক্ষেপে একটু নমুনা দিতেছি। আল্লাহ বলিতেছেন:—"অতএব স্বজনগণকে, এবং কাঙ্গাল ও (দুঃস্থ) বিদেশী পথিকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য (পরিশোধ করিয়া) দাও, আল্লার সন্তোষ প্রার্থনা যাহারা করে- তাহাদের পক্ষে ইহাই উত্তম;—আর এই সব লোকই হইতেছে সফলকাম, (৩৮) আর পরের ধনকে গ্রাস করতঃ বর্দ্ধিত হইবে মনে করিয়া তোমরা যে ধনসম্পদ সুদে খাটাইয়া থাক, আল্লার সন্নিধানে তাহা কদাচিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু —আল্লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে জাকাত প্রদান করিয়া থাক,—(জানিয়া রাখ) এই শ্রেণীর লোকেরাই ত (জাতীয় সম্পদ) বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে (৩৯)।"

এছলামের সাধারণ নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বিশেষতঃ উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছগুলির প্রতি সম্যকভাবে দৃষ্টিদান করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, আমরা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব যে, এছলামের আদেশ নিষেধগুলিকে এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিলে সুদখোর মহাজনদিগের দ্বারস্থ হওয়ার কোন দরকারই মুছলমানের থাকিবে না। মুছলমানের জাতীয় জীবনে এই সমস্যা উপস্থিত না হইতে পারে, এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতাআলা প্রথমে জাকাতকে তাহাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া তাহার পর সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। তাহার পর, আল্লাহ ও তাঁহার রছুল সুদের বর্ণনা প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, অভাবগ্রস্ত দীন দরিদ্র ও বিপন্ন জনগণকে সুদের হাত হইতে রক্ষা করার একমাত্র উপায়—জাকাতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল মাল তহবিল'। মুছলমান সমাজ, আজ সাধারণভাবে জাকাত দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা জাকাত দিয়া থাকেন—অথবা দিয়া থাকেন বলিয়া প্রকাশ, তাঁহাদের

মধ্যে ঠিকমত হিসাব করিয়া যোলআনা জাকাত এক সঙ্গে বাহির করিয়া থাকেন, এরূপ লোক খুব কমই আছেন। আবার এই জাকাতের টাকাগুলি, দাতাদিগের অনুগ্রহ দানের ন্যায়, নিতান্ত অসঙ্গত ও অসংযত ভাবে এবং শরিয়তের নির্দ্ধারিত বিধিব্যবস্থার বিপরীত প্রকারে, ধনীদিগের খোশখেয়াল অনুসারে ইতস্ততঃ বিতরিত বা অপব্যয়িত হইয়া থাকে। সে জন্য অপাত্রে দানের ফলে দাতাদিগের যশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অকর্ম্মা ভিক্ষুকের সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতে থাকে মাত্র— জাকাতের মহান নির্দ্দেশের মধ্যে আল্লার যে মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, প্রচলিত ব্যবস্থায় তাহা আংশিকভাবেও সফল হইতে পারে না।

'রেবার' ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়—সমবায় সমিতির মুনাফার অংশ, ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার সুদ, এবং এই শ্রেণীর আরও কতকগুলি জিনিষ ঠিক 'রেবা' পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। এই জন্য মিসর ও ভারতের কতিপয় গণ্যমান্য আলেম ঐ সকল সুদ গ্রহণের অনুকূলে – প্রত্যক্ষতঃ বা প্রকারতঃ—মত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার সুদ সম্বন্ধে ভারতের বর্ত্তমান আলেম-দিগের মধ্যে মওলানা মুফতী মোহাম্মদ কিফায়েতুল্লাহ এবং আহলে হাদিছ সম্প্রদায়ের নেতা ও আমিরে-শরিয়ত মওলানা আবুল-অফা ছানাউল্লা ছাহেবের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি কেবল এইটুকু মাত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সুদ-সমস্যা মুছলমানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছে এছলামকে অতিক্রম করিয়া—তাহাকে অবলম্বন করিয়া নহে। এছলাম এ সমস্ত সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধানের সম্যক ব্যবস্থা করিয়াই সুদের

নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছে। কোরআনের বর্ণিত 'রেবা' শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপ ও প্রকার সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এ প্রবন্ধের আদৌ উদ্দেশ্য নহে এবং তাহা আমার পক্ষে সহজ সাধ্যও নহে। আজকাল আমাদের দেশে 'রেবার' স্বরূপ ও প্রকার সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সাধারণতঃ যেরূপ সহজ মনে করা হইয়া থাকে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এমাম ও মোহাদ্দেছগণও তাহাকে ততটা সহজ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নহি। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

"باب الربا من اشكل الابواب على كثير من اهل العلم"

অর্থাৎ—"সুদের অধ্যায়টী অধিকাংশ আলেমের নিকট একটা কঠিনতম বিষয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।" অতএব আমার মত অল্প পূঁজী লেখকের পক্ষে ইহা যে কতদূর কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

উপসংহারে বাঙ্গলার ভক্তিভাজন আলেম মহোদয়গণের খেদমতে আমাদের বিনীত নিবেদন—এখন হইতে তাঁহারা মুছলমানের প্রত্যেক পল্লীকে এছলামের বিধান অনুসারে জমা'আৎবদ্ধ করিয়া নিয়মিত ভাবে জাকাত আদায়ের ও তাহার যথাবিধি সদ্ব্যয়ের সুব্যবস্থা করার জন্ম নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করুন। সুদের অর্থাৎ দিন-দুনয়ার সকল প্রকার ধ্বংসের হাত হইতে মুছলমানকে রক্ষা করিতে হইলে, কোর-আনের ধারা ও তাহার স্পষ্ট শিক্ষা অনুসারে, সর্ব্বপ্রথমে 'বাইতুল মাল' তহবিল গঠনের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জাকাত আদায়ের ও 'বাইতুল মাল' তহবিলের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই। হজরত ওমর ত ইহাকে আহকাম সংক্রান্ত শেষ আয়ত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত বিধিব্যবস্থা সম্পন্ন করার

পর সকলের শেষে সুদের নিষেধাজ্ঞা মূলক আয়ত কেন অবতীর্ণ হইয়াছিল, এখানে তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। তাঁহারা এতদিন কোরআনের শিক্ষা এবং এছলামের কর্ম্মধারাকে উপেক্ষা করিয়া সুদ বন্ধ করার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, সেই জন্যই তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা এ যাবৎ বিফল হইয়া গিয়াছে।

## গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

**কোরান শরীফ আমপারা**

বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ—মূল্য ২।০

**উম্মুল কেতাব**

সুরা ফাতেহার তফছির—মূল্য ।৵০

**কোরান শরীফ ( ১ম খণ্ড )**

ছুরা ফাতেহা ও বকরাহ্‌এর বঙ্গানুবাদ—মূল্য ৪॥০

**কোরান শরীফ ( ২য় খণ্ড )**

আল্‌ এমরানের বঙ্গানুবাদ—মূল্য ৩॥০

**মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য**—মূল্য ॥৵০